CONTAINS EXCLUSIVE BANGLA AND ENGLISH CONTENT

the ULABian

A Student Mouthpiece

হার না মানার গল্প ● পৃষ্ঠা ৩

কিংবদন্তি রফিকুল ইসলাম ● পৃষ্ঠা ৬

msj.ulab.edu.bd/bss/ulabian, স্প্রিং ২০২২, ৬৮৮ বেরিবাঁধ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

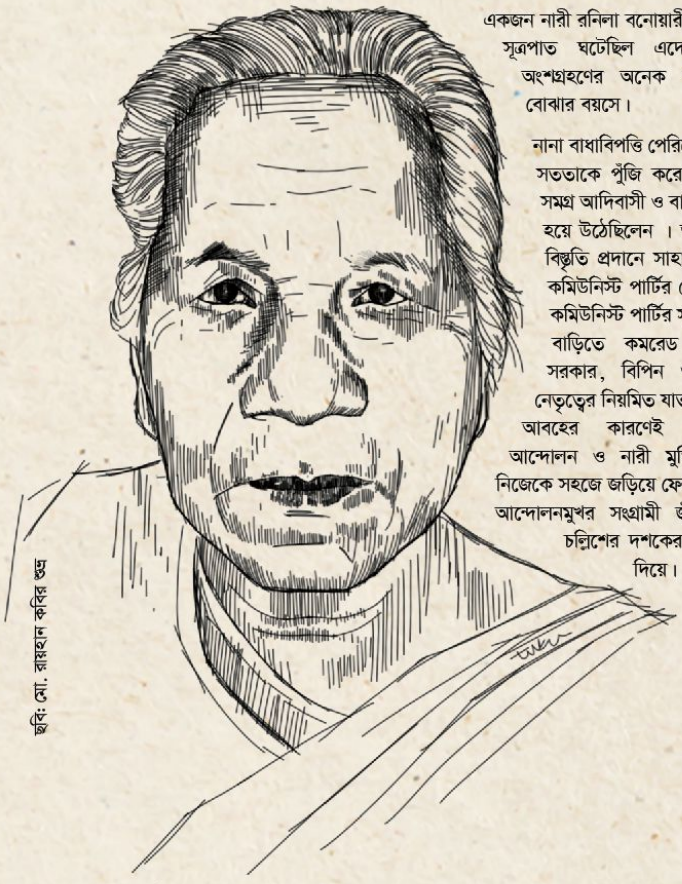

ছবি: মো. রায়হান কবির শুভ্র

রনিলা বনোয়ারী

এ ক অ চে না বি প্ল বী

মো. রায়হান কবির শুভ্র

একজন নারী রনিলা বনোয়ারী, যাঁর সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল এদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের অনেক পূর্বে, কোনোকিছু না বোঝার বয়সে।

নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সাহস, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সততাকে পুঁজি করে তিনি গারো পাহাড়ের সমগ্র আদিবাসী ও বাঙালিদের নিকট মহিরুহ হয়ে উঠেছিলেন । তাঁর এ গ্রহণযোগ্যতাকে বিস্তৃতি প্রদানে সাহায্য করেছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সান্নিধ্য। বাবা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত থাকায় তাঁদের বাড়িতে কমরেড মণি সিংহ, ললিত সরকার, বিপিন গুণসহ অনেক বিপ্লবী নেতৃত্বের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। পারিবারিক আবহের কারণেই পরবর্তীকালে কৃষক আন্দোলন ও নারী মুক্তির আন্দোলনে তিনি নিজেকে সহজে জড়িয়ে ফেলতে পেরেছিলেন। তাঁর আন্দোলনমুখর সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত ঘটে চল্লিশের দশকের টঙ্ক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোনা, শেরপুরসহ বেশ কিছু জেলার বিভিন্ন স্থানে টঙ্ক প্রথা চলে আসছিল, যা দরিদ্র কৃষকদের জন্য অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। শোষিত, বঞ্চিত কৃষকেরা এ টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে একত্রিত হয়। ধীরে ধীরে ময়মনসিংহ অঞ্চলের উত্তর দিকে এ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে ।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন,

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
...
তুমি আসবে বলে ছাই হল গ্রামের পর গ্রাম।

কবির কবিতার এ পঙক্তিগুলোতে আভাস মেলে কতশত ত্যাগ আর হারানোর বিনিময়ে বাঙালির কাছে ধরা দিয়েছে তাঁদের স্বাধীনতা। এ ত্যাগ স্বীকারের দৌড়ে তখনকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ - কেউ সরাসরি যুদ্ধে নেমে, কেউ যোদ্ধাকে সহায়তা করে, কেউ বাড়ি ছেড়ে, কেউ দেশ ছেড়ে, কেউ আপনজনকে হারিয়ে, কেউ বা আবার সম্ভ্রমের বিনিময়ে। মুক্তির এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কথা বললে মূলত পুরুষের অংশগ্রহণের কথা সমুখে আসে, তবে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণও কম নয়। তেমনই

টঙ্ক আন্দোলনের ঝড়ে গারো পাহাড় যখন ভূমিকম্পের ন্যায় কম্পিত হচ্ছিল, তখন তিনি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। স্কুলের সামনে দিয়ে মিছিল যাচ্ছিল। ওই শিশু বয়সেই তিনি সে মিছিলে যোগ দেন। টঙ্ক আন্দোলনের মহানায়ক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব কমরেড মণি সিং-এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ১৯৫০ সালে টঙ্ক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

টঙ্ক আন্দোলনের পর থেকে নির্যাতিত হাজংরা ভারতে চলে যেতে থাকে। এদের মধ্যে এ দেশে যারা রয়ে যায় তাদের অধিকাংশ ছিল খুবই দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণির। সংগ্রামী এ সম্প্রদায়টি নিষ্পেষিত হচ্ছিল দরিদ্রতার করাল গ্রাসে। আর তাকে পুঁজি করে লুটেরা মহাজন ও সাম্রাজ্যবাদের এদেশীয় দালাল গোষ্ঠী ওই অঞ্চলের আদিবাসীদের অধিকার হরণ করতে থাকে, সম্পদ লুণ্ঠন করতে থাকে। আদিবাসীদের ওপর চলতে থাকা শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কী ভাবে নিজেদের অধিকার আদায় করতে হবে, সে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল রনিলা বনোয়ারীর নিত্যদিনের কাজ। হাজং নারীদের লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে দাবি আদায়ের কৌশল তিনিই প্রথম শিখিয়েছিলেন।

রনিলা বনোয়ারীর সংগ্রামী জীবনের এ দৃপ্ত কিরণ কেবল টঙ্ক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্তিমিত হয়ে যায়নি, মহান মুক্তিযুদ্ধেও ছিল তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৭১ সাল, টালমাটাল সারাদেশ। পাক সরকারের বাঙালি বিদ্বেষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যার প্রকাশও ঘটছিল বন্দুকের ভাষায়। যুদ্ধের দামামা ছড়িয়ে পড়ে বাংলার প্রত্যেক জনপদে। তেমনই এক জনপদ সুসং-দুর্গাপুর। মুক্তিযুদ্ধকালে হানাদার বাহিনীর মেজর সুলতানের নেতৃত্বে দুর্গাপুরের মিশনারিজ এলাকা বিরিশিরিতে শক্তিশালী একটি সেনা ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। পাক জান্তারা সেখানে বসেই বাংলার কুখ্যাত দালাল, আলবদর, রাজাকারদের সহযোগিতায় নিয়ন্ত্রণ করত দুর্গাপুর সদরসহ কলমাকান্দার সীমান্তবর্তী এলাকা লেংগুড়া, নাজিরপুর এবং দুর্গাপুরের বিজয়পুর। রাতের আঁধারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হতো বিরিশিরির মুক্তিকামী মানুষদের।

নারকীয় এ হত্যাযজ্ঞের খবরে চরম ব্যথিত হতেন রনিলা বনোয়ারী। এমন পরিস্থিতিতে তিনি অনুধাবন করেন মুক্তিযুদ্ধে যাবার সময় এসে গেছে। হানাদারের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করবার নেশায় তিনি যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে চলে যান ভারতের মেঘালয় ক্যাম্পে। ওই ক্যাম্পে দেওয়া হতো কয়েক ধরনের ট্রেনিং। সিভিল ডিফেন্স, নার্সিং, অস্ত্র চালনা ও গেরিলা আক্রমণ। ক্যাম্পে প্রথম দিকে নারীদের সরাসরি অস্ত্র প্রশিক্ষণের অনুমতি না থাকায় শুধু নার্সিং ও আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নেন তিনি। গেরিলা অপারেশনে সহায়তা, সংবাদ আদান-প্রদান, যুদ্ধক্ষেত্রের যোদ্ধাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, অর্থ-ওষুধ-খাদ্য-বস্ত্র সংগ্রহ, চিকিৎসা ও সেবাকার্য, খাদ্য ও আশ্রয়দান ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তাঁর।

নিত্যদিনের পরিধেয় সফেদ শাড়ির মতোই ছিল তাঁর হৃদয় ও মন। সেই কোমল মন নিয়েই নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রিত শরণার্থীদের নিরলসভাবে সেবা দিয়ে গেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি মেঘালয় ক্যাম্পে থেকেই আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করে গেছেন। নিজের পরিবার ও স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শুধু দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন এ মহীয়সী নারী। পরাধীনতার জিঞ্জির ভাঙতে হাতা-খুন্তি ফেলে শত্রু বিনাশের অসীম সাহস নিয়ে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে এনেছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর গুণী এ মানুষটি অলস বসে থাকেননি। জাতির ভবিষৎ গঠনে দুর্গাপুরের বালুচড়া স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। দীর্ঘদিন সেখানে আলোকবর্তিকা হয়ে ছড়িয়েছেন আলোর দিশা, নতুন প্রজন্মকে দিয়েছেন সুনাগরিক হবার দীক্ষা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী কীর্তিমতী সর্বজয়া এ নারী সকলকে কাঁদিয়ে ২০১২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পাড়ি জমান চিরকালের আবাসভূমে।

আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি

নাহিয়ান জামাল জয়িতা

আমার বয়স তখন মাত্র পাঁচ। সম্ভবত ২০০৪-এর ২৫ মার্চ। মা তৈরি করে দিলেন কালো কাপড় পরিয়ে। বললেন, 'আজ কালরাত্রি। আমরা শহিদ মিনারে যাচ্ছি।' আমার মনে প্রশ্ন জাগল, 'রাত তো কালোই হয়, এ আর নতুন কী?' এর উত্তর অবশ্য আমি পেয়েছি, তবে সেটা অনেক সময় পর।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সঙ্গে সেবার প্রথমবার আলোর মিছিলে যোগ দেই। মিছিল শুরু হওয়ার আগে সবাই একসঙ্গে সুর মিলিয়ে 'ও আলোর পথযাত্রী' গানটি গাইতে শুরু করে। শহিদ মিনারের শেষ সিঁড়িতে নামতেই গান থামিয়ে সবাই মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে। সেখান থেকে গুটিগুটি পায়ে হেঁটে চলি জগন্নাথ হলের দিকে।

মিছিলের একদম সামনের সারিতে দাঁড় করানো হয় আমাকে। এক হাতে মোমবাতি, আরেক হাতে ধরি মায়ের হাত। মিছিলে সবাই নিশ্চুপ। কেউ কোনো শব্দ করছে না। আমি একটু অবাক হই। এর আগে এমন নীরব মিছিল আমি দেখিনি। মোম গলে গলে একটু হাতে পড়তেই আমি শিউরে উঠছিলাম, তবে সহ্য করলাম। বুঝলাম, এখানে সবাই এতে অভ্যস্ত। জগন্নাথ হলের গেট অবধি পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমার মোমটা প্রায় ২৫ ভাগ জীবন খুইয়েছে, আবার মৃদু বাতাসে আমার হাতের মোমের প্রদীপের অবস্থা অনেকটা নিভুনিভু। তার সঙ্গে যেন মিছিলের নিস্তব্ধতা আরেকটু বেড়ে গেল।

গেট দিয়ে ঢুকতেই বুঝতে পারলাম কেন? আমাদের হাতের মোমগুলো ছাড়া আর কোনো আলো জ্বলছে না। আশেপাশে ছড়ানো ছিটানো কিছু পুতুল, খুব বীভৎস আর রক্তাক্ত দেখতে সেগুলো। আমরা মাঝামাঝি একটা জায়গায় দাঁড়াতেই ৭১-এর একটি রেডিও সংবাদ বেজে উঠল স্পিকারে, যেখানে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে ঘটে যাওয়া গণহত্যার বিবরণ দেওয়া হয়। আমার গায়ে কাঁটা দেয়। পুতুলগুলোর দিকে যতই তাকাই, তারা যেন ততই জীবন্ত হয়ে ওঠে। স্মৃতিস্তম্ভে মোমবাতিগুলো রেখে মায়ের সাথে পুরো হল প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখি। কিছু কিছু পুতুলের ওপর নাম এবং পরিচয়ের বিবরণ লাগানো ছিল। আমি তখনও খুব বেশি পড়তে শিখিনি, তাই মাকে বললাম পড়ে শোনাতে। যাঁদের বর্ণনা দেয়া ছিল, তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

সেই রাতে আমার আর ঘুম হলো না। সারারাত একটাই প্রশ্ন ঘুরতে থাকে মাথায়-পুতুলগুলোই যদি দেখতে এতটা ভয়ংকর হয়, তাহলে যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে, তাদের তখনকার স্মৃতিগুলো কতটা ভয়ংকর হতে পারে? সারারাত আমার দাদার কাছে শুনি তাঁর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার গল্প। শুনি কী করে পাক সেনাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। তিনি জীবিত ফিরেছেন, কিন্তু তাঁর অনেক বন্ধুর সেই ভাগ্য হয়নি। তিনি বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের মানুষ ছিলেন, তাঁর সেই গল্পও শোনালেন। ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা এবং শরণার্থী শিবিরে কাটানো যুদ্ধপরবর্তী কিছু সময়ের গল্প। তাঁর গল্পে ছিল গর্ব, দেশপ্রেম আর বিজয়ের গৌরব।

সকাল হতেই আমি আর মা আমার নানুর বাসায় রওনা হলাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজের খুব কাছেই আমার নানুর বাসা। যুদ্ধের সময় সবাই সে বাসাতেই ছিলেন। আর ৭১-এর ২৫ মার্চ রাতের সেই আতঙ্ক খুব কাছ থেকেই অনুভব করেছেন তারা। মা গাড়ি থেকেই গল্প বলতে শুরু করেছেন। মা যুদ্ধের সময় দুই বছরের শিশু। সে সময়ে কী ঘটেছিল তা তার বুঝবার কথা নয়। যা কিছু জেনেছেন তার সবই আমার নানু এবং তার দাদির কাছে শোনা।

আমার কৌতূহল তখন আকাশচুম্বী। গাড়ি থেকে নেমেই বসে পড়লাম নানুর খাটে। আমার আবদার শুনে একটু অবাকই হলেন নানু, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনো দ্বিধা ছিল না তাঁর। একের পর এক প্রশ্ন করে যা জানলাম, তা আমার চোখে পানি নিয়ে আসে। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে তাঁদের অভিজ্ঞতার গভীরতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। সে বয়সে বেশি কিছু বুঝিনি, শুধু শুনেছিলাম। আমার এক নানাকে মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আরেকজন তাঁকে খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে যান। গল্প শেষ হতে হতে আমার নানুর গলা ভার হয়ে আসে, যেন সেদিন স্মৃতিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। আমার কাছে তখন মুক্তিযুদ্ধ শুধু ইতিহাসের একটি অংশ হয়ে থাকে না, আমার পারিবারিক অনুভূতি আর ব্যক্তিগত আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

সেসব লোমহর্ষক গল্পগুলো আমাকে উৎসাহিত করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়তে, আরও বেশি জানতে, কৌতূহলী হতে। ২০০৪ সালের সেই ২৫ মার্চ কালরাত্রি আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সারাজীবন ইংরেজি মাধ্যমে পড়লেও আমার সাহিত্য, আবৃত্তি কিংবা সংগীত দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ। ইতোমধ্যে আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্‌যাপন করেছি। কিন্তু আমার দাদা এবং আমার নানু সেই একই বছর আমায় ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁদের শূন্যতার মাঝেও তাঁদের অবদানে আমার মাঝে দেশপ্রেমের যে জাগরণ ঘটেছে তা শিকড়ে আবদ্ধ করে রাখবে। আমি এবং আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত এ গৌরব, শূন্যতা, আবেগ আর দেশাত্মবোধ আমাদের অনুভূতিতে গেঁথে থাকবে চিরকাল।

পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বদ্ধপরিকর। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের জানাতে পারেন নির্দ্বিধায়। কিংবা আপনিও হয়ে উঠতে পারেন 'দ্য ইউল্যাবিয়ান' পরিবারের একজন। আপনার লেখা গল্প, কবিতা, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অথবা ছবি পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়:

theulabian@ulab.edu.bd

দ্য ইউল্যাবিয়ান দল: প্রধান উপদেষ্টা: প্রফেসর জুড উইলিয়াম হেনিলো, পিএইচডি, উপদেষ্টা সম্পাদক: বিকাশ সিএইচ ভৌমিক, সম্পাদক: জান্নাতী ফেরদৌসী মীম, সংবাদকর্মী ও সহযোগী: মো. রায়হান কবির শুভ্র, বিশ্বজিৎ দাস বিজয়, মোঃ আবিদ হাসান সোহাগ, গিবসন মধু এরিক, নাহিয়ান জামাল জয়িতা, মাহযাবীন ইউসুফ, কাজী আঞ্জুম আকিব, আনাস ইমরান, মন্দ্রিলা মধুরিমা, নাজিফা আহমেদ, নকশা ও অলংকরণ: 'দ্য ইউল্যাবিয়ান ডিজাইনিং টিম'

ইউল্যাবের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি প্রাণবন্ত মুহূর্তে লুক গ্রেনফেল-শো *ছবিসূত্র: ইউল্যাব কমিউনিকেশন্স*

একজন ক্যানলিভারের হার না মানার গল্প শুনল ইউল্যাবের শিক্ষার্থীরা

আবদুল্লাহ আবু সাঈদ প্রসূন

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর শিক্ষার্থীরা শুনল হার না মানা এক মানুষের মুখে তাঁর যুদ্ধজয়ের গল্প। ২০ মার্চ ২০২২-এ ইউল্যাবের এক আয়োজনে এসে অংশগ্রহণকারীদের জীবনের রূঢ় বাস্তবতার গল্প শোনান এ হার না মানা মানুষটি।

বলছি লুক গ্রেনফেল-শো এর কথা, যিনি একজন ব্রিটিশ বাইকার এবং ক্যানলিভার - ক্যান্সার আক্রান্ত একজন ব্যক্তি।

অনুষ্ঠানে গ্রেনফেল-শো তাঁর ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার ইতিহাস বলতে গিয়ে বলেন, ২০১৮ সালের জুন মাসে প্রথমবারের মত তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ে, যা ততক্ষণে চতুর্থ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। চিকিৎসকরা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, ক্যান্সার তার ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। হাতেও তাই সময় খুবই কম।

শো খুব স্বাভাবিকভাবেই মুষড়ে পড়েছিলেন সেদিন। কিন্তু ভেঙে পড়েননি। তিনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সেসময়ে তাঁকে তাঁর আগামীকালকে নিয়ে পুনর্বার ভাবতে হয়েছে, কেননা জীবন তাঁর জন্য আর ঠিক আগের মতো ছিল না। মনোবল না হারিয়ে জীবনকে ভিন্নভাবে এবং পূর্ণভাবে উপভোগ করার চিন্তাটা মাথায় আসে তখনই। সে ধারাবাহিকতায় নিজের শক্ত মনোবলকে পুঁজি করে তিনি ৩০ হাজার কিলোমিটার সাইক্লিং করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল থেকে শুরু হয়ে সে যাত্রা চলবে চীনের বেইজিং পর্যন্ত।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে শো আরও বলেন, গুরুত্বপূর্ণ এটি নয় যে আপনি নিজের জীবনের সকল পরীক্ষা কী ভাবে গ্রহণ করবেন, বরং গুরুত্বপূর্ণ এটি যে আপনি কী ভাবে চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি সাড়া দিবেন। গ্রেনফেল-শোর জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়ার এ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ইউল্যাবের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি
বিশ্বকে অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের দিকে ধাবিত করে
ইউল্যাবে সেমিনারে অধ্যাপক সৈয়দ মনসুব মুর্শেদ

ইউল্যাবিয়ান ডেস্ক

বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিশ্বকে একটি অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের দিকে ধাবিত করে - 'ইলিবারেল ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইনইকুয়ালিটি ইন দ্য কনটেক্সট অব গ্লোবালাইজেশন' শিরোনামে ইউল্যাবে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে এমনটি দাবি করেন নেদারল্যান্ডসের ইরাসমাস ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ (আইএসএস)-এর অধ্যাপক সৈয়দ মনসুব মুর্শেদ।

২৮ মার্চ ২০২২-এ আয়োজিত এ সেমিনারে তিনি আরও বলেন, বিশ্বায়ন এবং পুঁজিবাদের নিয়মগুলো কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণি যারা আন্তর্জাতিকভাবে দক্ষ ও সম্পদশালী তাদের উদ্দেশ্য পূরণে ভূমিকা রাখে।

একই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের কভেন্ট্রি ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির এ শিক্ষক মনে করেন, একটি উদারপন্থী সমাজ সর্বদা সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, নির্বাহী বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ থাকে, একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় বিশ্বাস রাখে এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সামসাদ মর্তুজা, বিভাগীয় প্রধানগণসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন অধ্যাপক সৈয়দ মনসুব মুর্শেদ *ছবিসূত্র: ইউল্যাব কমিউনিকেশন্স*

সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিকতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউল্যাবের উপাচার্য ছবি: ইউল্যাব কমিউনিকেশন্স

ইউল্যাব এবং ভারতের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি

ইউল্যাবিয়ান ডেস্ক

বাংলাদেশের অন্যতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর সঙ্গে ভারতের দেড়শ বছরেরও বেশি প্রাচীন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২১ এপ্রিল ২০২২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত এ সমঝোতা স্মারকে ইউল্যাবের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী ব্যানার্জি স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্যদ্বয় আশা করেন, স্বাক্ষরিত চুক্তির অধীনে প্রতিষ্ঠান দুটি গবেষণা, প্রকাশনা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের উৎকর্ষতা সাধনে সক্রিয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

মুম্বাই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইউল্যাবের অংশগ্রহণ

ইউল্যাবিয়ান ডেস্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইরাসমাস প্রজেক্টের সদস্য হিসেবে ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমানের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ভারতের মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। ২৩ মার্চ ২০২২-এ শুরু হওয়া 'ইন্টারন্যাশনালাইজেশন অ্যান্ড ভার্চুয়াল এক্সচেঞ্জঃ বর্ডারলেস বিটুইন ইইউ অ্যান্ড এশিয়ান কান্ট্রিজ' শিরোনামের দুদিনের এ সম্মেলনটি আয়োজন করে এসভিকেএম-এর নরসি মঞ্জি ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজের (এনএমআইএমএস) আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ।

ইউল্যাব প্রতিনিধি দলটির সম্মেলনে অংশগ্রহণের সময় সম্মেলনের আয়োজক প্রতিষ্ঠান এনএমআইএমএস-এর সঙ্গে ইউল্যাবের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের অধীনে প্রতিষ্ঠান দুটি নিজেদের মধ্যে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের উৎকর্ষতায় অবদান রাখবে।

ইউল্যাবের উপাচার্যের সঙ্গে সম্মেলনে অংশ নেওয়া প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- সেন্টার ফর ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড কোয়ালিটেটিভ স্টাডিজ (সিকিউএস)-এর পরিচালক অধ্যাপক সুমন রহমান, ইউল্যাব ইন্টারন্যাশনাল অফিসের পরিচালক আবু রাসেল এবং মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক দিলশাদ হোসেন দোদুল।

আমার হারিয়ে যাওয়া শ্রাবণ মেঘের দিনগুলো!

▶ পৃষ্ঠা ১২ এর পর

পড়াশুনা করব, এ লক্ষ্যে আমার জীবন এগিয়ে যাচ্ছিল। অবসরে গল্প লেখা, বৃষ্টি হলে ঘুরে বেড়ানো, অচেনা অজানা শহরে মানুষের ভিড়ে আমি কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছিলাম। প্রতিরাতে বাসার মানুষগুলোকে মনে করে হাউমাউ করে কাঁদতাম। দিনগুলো যেমন তেমন ব্যস্ততার মাঝে কেটে গেলেও রাতগুলো আমার জন্য তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল।

সিদ্ধান্ত নেই দেশে ফিরে আসব। তেমনটিই করি। দেশে ফিরে ভর্তি হই ইউল্যাবে। এখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। চলার পথে ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছে হাজারো। এ হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও আমি শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিকে ভুলতে পারিনি। এখনও বৃষ্টিপতনের টুপটাপ সংগীত ধ্বনিত হয় আমার হৃদয়জুড়ে। আমি ভিজতে থাকি অঝোরে, ভাগ করে নেই আমার সকল সুখ-দুঃখ, ভেজা মাটির গন্ধে হারিয়ে যাই বারেবার। মনে দানা বাঁধে দস্যিপনা। কখনও কখনও গলা ছেড়ে রবি ঠাকুরের সুরে গলা মেলাই,

'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে
জানি নে, জানি নে
কিছুতে কেন যে মন লাগে না।'

শ্রাবণ মাস এলেই মনে হয়, বৃষ্টির ফোঁটা আকাশে প্রথম সুচন্দা দিদিকে ছুঁয়ে মাটিতে এসে আমাকে ছুঁয়ে দিয়ে যায়।

ইউল্যাবের সঙ্গে ডব্লিউভিবি'র সমঝোতা স্মারক সই

ইউল্যাবিয়ান ডেস্ক

ইউল্যাব এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ (ডব্লিউভিবি) ৭ মার্চ ২০২২-এ একটি যৌথ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারকে ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান এবং ডব্লিউভিবি'র জাতীয় পরিচালক সুরেশ বার্টলেট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

পক্ষ দুটি দাবি করে, সমঝোতা স্মারক ইউল্যাব এবং ডব্লিউভিবি'র মধ্যে এক অংশীদারিত্ব-ভিত্তিক পথচলার সূচনা করেছে।

সমঝোতা স্মারকের অধীনে প্রতিষ্ঠান দুটি বাংলাদেশের প্রান্তিক, অসুরক্ষিত কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের ওপর একটি যৌথ গবেষণা পরিচালনা করবে। ইউল্যাব এবং ডব্লিউভিবি আশা করে, গবেষণালব্ধ ফলাফল ডব্লিউভিবিসহ অন্যান্য এনজিও, আইএনজিও, সরকার কিংবা সুশীল সমাজকর্তৃক পরিচালিত যুব সংশ্লিষ্ট চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইউল্যাব ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ-এর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ ছবি: ইউল্যাব কমিউনিকেশন্স

চলো খুঁজি পাখিদের পূর্বসূরী!

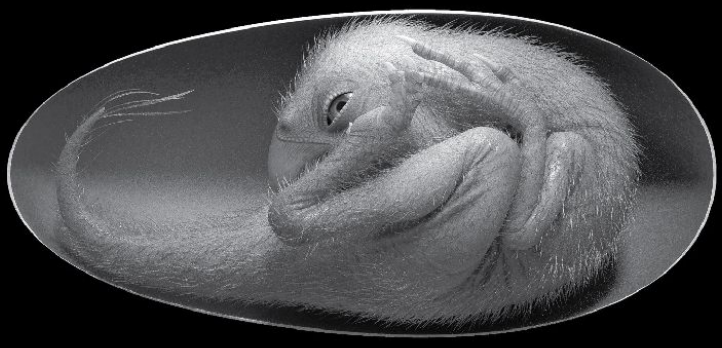

ডাইনোসরের ভ্রূণ, ছবি: সি নেট

তামজিদ ফরহাদ খান

স্টিভেন স্পিলবার্গের 'জুরাসিক পার্ক' এর পটভূমি মনে পড়ে? কী ভাবে অ্যাম্বারে সংরক্ষিত প্রাগৈতিহাসিক কালের মশা হতে ডাইনোসরের ডিএনএ সংগ্রহ করে ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় বিলুপ্ত প্রাণী ডাইনোসর পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। এ কল্পকাহিনি যদি বাস্তবে ঘটে যায়! তেমনই এক ঘটনা কিন্তু ঘটেছে। ড্রাগন-রাজ্য চীনে ৬৬ মিলিয়ন অর্থাৎ ৬৬০ লক্ষ বছর পুরনো ডাইনোসরের ভ্রূণ অনুসন্ধানে সক্ষম হয়েছেন জীবাশ্ম বিজ্ঞানী এবং গবেষকগণ।

জীবাশ্মবিদ ও গবেষক ড. ফিওন ওয়াইসুম মা তাঁর গবেষণা হতে জানান, ভ্রূণটি প্রাগৈতিহাসিক কাল হতেও আদিম। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আধুনিক কালে পাখির ডিম ফুটে বাচ্চা বেড়িয়ে আসার সময় পাওয়া অঙ্গ বিন্যাসের সাথে ভ্রূণটির মিল পাওয়া যায়। এ অনুসন্ধান সমসাময়িক পাখিকুলের সাথে ডাইনোসরের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে ব্যাপক সাহায্য করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভ্রূণটি সর্বপ্রথম পাওয়া যায় প্রায় দুদশক পূর্বে, ২০০০ সালে। দক্ষিণ চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের গানঝউ শহরে ইংলিয়াং নামক খননকারী প্রতিষ্ঠান এটি আবিষ্কার করে। তাদের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় 'বেবি ইংলিয়াং'।

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের ধারণা মতে, এ ভ্রূণ ওভিরাপ্টোরোসরস নামক দাঁত বিহীন থেরোপড গ্রুপের অন্তর্গত পাখিসদৃশ ডাইনোসর হতে পারে; কেননা, ওভিরাপ্টোরোসরস-এর মতো এর দাঁত বিহীন খুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

ওভিরাপ্টোরোসরস অর্থ 'ডিম চোর টিকটিকি', যাদের সামনের দুটি পা ছোট থাকায় পেছনের দুই পা ব্যবহার করে হাঁটত। ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ ৬৬ মিলিয়ন বছরেরও পূর্বে এরা বর্তমান এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকা অঞ্চলে বাস করত।

আরও জানা যায়, বর্তমান পাখিকুলের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার অব্যবহিত পূর্বে ভ্রূণ যে অবস্থায় থাকে, যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'টাকিং' বলে, ঠিক একই ভঙ্গিমায় এদের ভ্রূণ ডিমের ভেতর অবস্থান করে। এটি এমন সম্ভাবনা দেখায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে নন-এভিয়ান (অর্থাৎ যারা উড়তে পারত না) থেরোপডদের মধ্যে 'টাকিং' আচরণ প্রথম বিকশিত হতে পারে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ওভিরাপ্টোরোসরস ডিম ফোটার আগে স্বতন্ত্র 'টাকিং' ভঙ্গিতে থাকত, যা পাখির পূর্বসূরী হিসেবে এটিকে আখ্যা দেয়ার পক্ষে শক্ত প্রমাণ। ভ্রূণটি মাথা হতে লেজ অবধি ১০.৬ ইঞ্চি (২৭ সে.মি.) লম্বা, যা চীনের ইংলিয়াং স্টোন নেচার হিস্ট্রি মিউজিয়ামে ৬.৭ ইঞ্চি (১৭ সে.মি.) ডিমের ভেতর রয়েছে। ডিমের ভেতর ভ্রূণটির মাথা তার শরীরের ওপর রাখা, সামনের পা দুটির অংশবিশেষ মাথার দুপাশে এবং পিঠের অংশ ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো বাঁকানো। পূর্বে কোনো নন-এভিয়ান ডাইনোসরের ভ্রূণে এমন গঠন পাওয়া যায়নি।

গবেষকদের মতে, জীবাশ্মটি নিজ সত্তায় অনন্য। এর হাড়ের গঠনে যে সম্পূর্ণতা, অঙ্গবিন্যাসে যে সুসজ্জা, তা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এ বিরল নমুনাটির আরও গভীর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গেলে ভবিষ্যতে হয়তো বিস্ময়কর কোনো তথ্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে!

না খেয়েই খাবারের স্বাদ গ্রহণ

সাদিয়া সিমরান জুমানা

ধরুন অনেক দিন হয়ে গেছে, কিন্তু আপনার খুব পছন্দের খাবারটি খেতে পারছেন না। এরপর কী করবেন? নিশ্চয়ই সেটি খেতে চাইবেন! তাই তো? তবে ভাবুন তো যদি ঘরে বসেই খাবারের নাম বলা মাত্রই জিহ্বাতে অবিকল স্বাদটি পেয়ে যান? এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা একদিন হয়তো আপনারও হবে। তবে সেরকম কিছু হতে হলে তো অদ্ভুত কিছুর প্রয়োজন পড়বে? সেটিই ঘটতে চলেছে। অদ্ভুত এক যন্ত্রের আবিষ্কার করেছেন জাপানের অধ্যাপক হোমি মিয়াশিতা। এটি এমন একটি যন্ত্র, যা দিয়ে মজার সব খাবারের স্বাদ নিবেন, কিন্তু পেট ভরবে না, আবার ওজন বেড়ে যাওয়ার চিন্তাও করতে হবে না।

করোনা মহামারিতে প্রায় সবকিছুই বন্ধ ছিল ২০২০ সালের প্রথম থেকেই। সব বন্ধ হওয়ার কারণে তিনি কোনো ভাবেই তাঁর পছন্দসই খাবার খেতে পারছিলেন না। রেস্তোরাঁয় গিয়ে না খেতে পারার আক্ষেপ থেকেই বানিয়ে ফেললেন 'টেস্ট দ্য টিভি' (টিটিটিভি) নামক এ যন্ত্রটি। টিটিটিভিতে বর্তমানে আছে ১০ রকমের মৌলিক স্বাদ, যা প্রাথমিকভাবে ২০ রকম খাবারের স্বাদ দেবে। এখনও অবাক লাগছে শুনে? গল্প শোনার মতো মনে হলেও এটিই সত্যি।

একটা সময় মোবাইল ফোনে গান শোনাও কিন্তু অসম্ভব মনে হতো, আর এখন আমরা কী না করছি! একবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ তার পছন্দের খাবারের নাম বলা মাত্রই বিশ্বের যেকোনো খাবার জিহ্বায় হাজির হবে, এটা যেন এখন আর ভাবনার বাহিরের নয়। সব খাবারের স্বাদ তাঁর যন্ত্রে যেন থাকে, ধীরে ধীরে এ পথে এগিয়ে যাচ্ছেন হোমি মিয়াশিতা। শীঘ্রই যন্ত্রটি বাজারজাত করার চিন্তাও আছে তাঁর। টিভি পর্দায় খাবারের ছবি দেখে বাটনে চাপ দিলেই সামনে রাখা পাত্রে স্প্রে হবে সেটি। হোমি মিয়াশিতার লক্ষ্য হলো, যেকোনো ব্যক্তির বাড়িতে থাকার সময়ও যেন বিশ্বের অন্য প্রান্তে একটি রেস্তোরাঁয় খাওয়ার মতো কিছুর অভিজ্ঞতা হয়। তাঁর এ চিন্তা সফল করতে গঠন করা হয়েছে ৩০ সদস্যের একটি দল। বাণিজ্যিকভাবে বানাতে গেলে খরচ পড়বে ৮৭৫ ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। আমরা যেমন মোবাইল ফোনে গান শুনি, তেমনই এটিও একসময় ডাউনলোড করা যাবে বলে দাবি তাঁর।

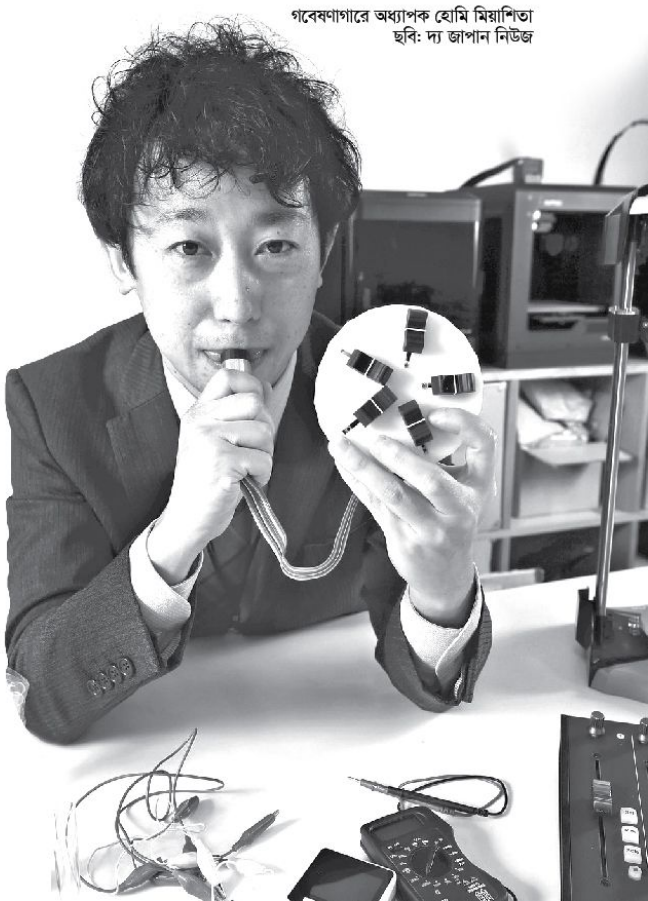

গবেষণাগারে অধ্যাপক হোমি মিয়াশিতা
ছবি: দ্য জাপান নিউজ

জা তী য় অ ধ্যা প ক

রফিকুল ইসলাম

মো. রায়হান কবির শুভ্র

পৃথিবীতে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা খ্যাতিমান ব্যক্তির জীবন ও কীর্তি নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা, তর্ক-বিতর্ক, সমালোচনা, সর্বোপরি সাধনা করতে করতে একদিন তাঁরা নিজেরাও নিজদের গণ্ডি পেরিয়ে বা স্বীয় সামাজিক অবস্থান থেকে আরও ওপরে উঠে যান এবং পৌঁছে যান খ্যাতির শিখরে।

এমনই একজন মহান মানুষের কথা আমরা জানি যিনি বাংলা ভাষার বিদ্রোহী কবি এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে মননে গেঁথেছেন নিজ মেধা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা, আর নিজেকে আসীন করেছিলেন এক অনন্য উচ্চতায়। তিনি রফিকুল ইসলাম। ভাষাসংগ্রামী রফিকুল ইসলাম। জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি তথা আমাদের সাহিত্যের, আমাদের জাতিসত্তার অনন্য এক ঠিকানা তিনি। বাংলাদেশে নজরুল বিষয়ক গবেষণায় তাঁর নাম সর্বাগ্রে। আমৃত্যু নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন নজরুল সাধনায়।

রফিকুল ইসলামের জন্ম পহেলা জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে, ব্রিটিশ শাসিত বৃহত্তর ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার মতলব উত্তর উপজেলার কলাকান্দা গ্রামে। পিতা মো. জুলফিকার আলী ছিলেন চিকিৎসক, মাতা জান্নাতুন নেছা একজন গৃহিণী। পিতার কর্মস্থল ঢাকায় হওয়ায় তিনি তাঁর কৈশোর কাল থেকে পিতার সাথে ঢাকায় অবস্থান করেন। সেখানেই তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন। ঢাকা কলেজ থেকে আইএ ও স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন রফিকুল ইসলাম। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ ঋষিতুল্য শিক্ষকগণের ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন তিনি।

ভাষাতত্ত্বে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে রফিকুল ইসলাম পাড়ি জমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে তিনি আরেকটি এমএ ডিগ্রি লাভ করেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে। এরপর মিনেসোটা ইউনিভার্সিটি, মিশিগান-অ্যান আরবার ইউনিভার্সিটি ও হাওয়াই ইউনিভার্সিটি এবং ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করেন। বাংলাদেশে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের গবেষণা যাদের হাত দিয়ে শুরু হয় রফিকুল ইসলাম তাঁদের একজন।

১৯৫৭ সালে শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। সে সময় তিনি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে বাংলা বিভাগে সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন, আর ভাষা বিজ্ঞানী অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইকে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে পেয়েছিলেন। অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর সম্পাদনায় 'সাহিত্য পত্রিকা' নামে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক যে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হতো সেখানে রফিকুল ইসলাম ও আনিসুজ্জামান সহযোগী হিসাবে কাজ করতেন।

রফিকুল ইসলামের বর্ণাঢ্য জীবনে বহুমাত্রিক কীর্তির মধ্যে প্রথমেই স্মরণে আসে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার কথা। ক্যামেরা হাতে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত দিনে তিনি যেসব ছবি তুলেছেন তা এখন আমাদের উজ্জ্বল গৌরবের অংশ। কেবল আমাদের বলি কেন, তা তো আজ বিশ্ব মানবের গৌরবের উৎস এবং বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক যত ছবি আছে তার অধিকাংশই রফিকুল ইসলামের ক্যামেরায় ধারণ করা।

বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে তিনি ছিলেন সামনের সারির সৈনিক। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁর সাহসী ভূমিকার কারণে তিনি পাক হানাদার বাহিনীর চক্ষুশূল হন। ১৯৭১ সালের ১৩ আগস্ট তাঁকে পাক বাহিনী গ্রেফতার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে নির্মমভাবে অত্যাচার করে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তিনি মুক্তিলাভ করেন। দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে রফিকুল ইসলাম সবসময় সম্মুখে থেকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে একাধিক বই রচনা করার মধ্য দিয়ে তিনি প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে গড়ে তুলতে পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নজরুল অধ্যাপক, ছিলেন নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম পরিচালক। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দশজন গবেষক নজরুল বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি উপাধি পেয়েছেন। শিক্ষকতা জীবনের দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশের অন্যতম সেরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর উপাচার্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও তিনি দক্ষ প্রশাসক হিসেবেও রেখেছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। আমৃত্যু ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি।

প্রখ্যাত নজরুল গবেষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি দুই বাংলায় সমধিক পরিচিত। নজরুলের জীবন ও সাহিত্য কর্ম নিয়ে তাঁর গবেষণা সঞ্চার করেছে নতুন মাত্রা। নজরুল সংগীতের স্বরলিপি বিন্যাসেও তাঁর ভূমিকা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। নজরুল ছাড়াও ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষাতত্ত্ব, বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ - এসব বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থমালা জ্ঞানী-গুণীদের আসরে বিশেষভাবে সমাদৃত। বাংলা একাডেমি থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' রচনায় তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাতীয় কবির প্রয়াণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নজরুলকে সমাধিস্থ করার ক্ষেত্রেও তাঁর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

রফিকুল ইসলামের বর্ণাঢ্য জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী এক সংগঠক। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে পালন করে গেছেন ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

কিংবদন্তিতুল্য এ মহান মানুষটি আজ আর যদিও আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তাঁর সুনিপুণ সৃষ্টি-কর্ম এবং সংগ্রামী জীবনকথা। তাঁর জীবনদর্শন ও সংগ্রামের পথ ধরে অসাম্প্রদায়িক সাম্যের বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে শামিল হওয়াই হবে তাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর শ্রেষ্ঠ উপায়।

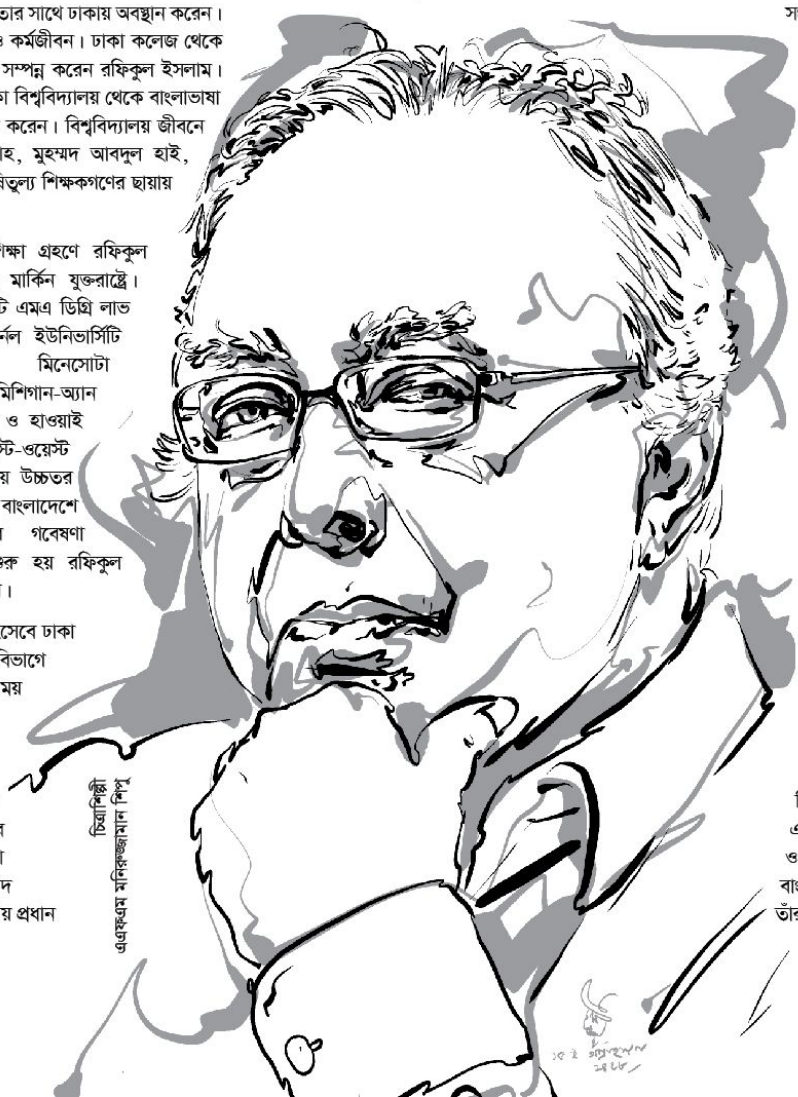

চিত্রশিল্পী
এএফএম মনিরুজ্জামান শিপু

পাহাড়ে চন্দ্রবিলাস

খন্দকার মাহিন আরাফাত

ঘুরতে ভালোবাসেন, অথচ পাহাড় পছন্দ করেন না - এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। তাই তো আমরা আনন্দে-দুঃখে, কারণে-অকারণে পাহাড় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ের সাথে আমরা যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এ সম্পর্ক যেন জন্ম-জন্মান্তরের। আমার পাহাড় ভ্রমণের হাতেখড়ি হয় ২০২২-এর জানুয়ারি মাসে। প্রথমবারেই পাহাড়ের সাথে আমার এক অলিখিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খুব অচেনা জায়গাটাও একপলকে কেমন করে খুব চেনা, খুব কাছের হয়ে ওঠে।

সেমিস্টার ব্রেক শুরু হওয়ার পর থেকেই কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। তখন হঠাৎ করেই সুযোগ আসে পাহাড় ভ্রমণের। তবে এর আগে যেহেতু পাহাড় ভ্রমণের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই প্রথমে একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। অন্যদিকে নতুন কিছুর অভিজ্ঞতা হবে, এমন আশায় উত্তেজিতও ছিলাম। ভয় আর উত্তেজনা নিয়েই আমি আমার ব্যাগ গোছাতে শুরু করি। ব্যাগ গুছিয়ে ছোট একটু ঘুম। ঘুম থেকে উঠেই রওনা হই ঢাকার উদ্দেশ্য, ঢাকা থেকে বাস পরিবর্তন করে বান্দরবান।

ভোরবেলায় বান্দরবান পৌঁছেই রীতিমত অবাক হই। প্রচণ্ড শীতে আমার হাত-পা কাঁপাকাঁপি করতে শুরু করল। তবে বান্দরবানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাছে এ কষ্ট যেন কোনো কষ্টই না। এরপর ফ্রেশ হয়ে সকালের নাস্তা করে আরেক স্তর গরম কাপড় জড়িয়ে রওনা হলাম পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। বান্দরবানের আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি চলতে থাকল পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে যেন নতুন নতুন অভিজ্ঞতার হাতছানি। তবে আরও বড় অভিজ্ঞতা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাকা রাস্তা শেষ, অথচ গন্তব্য এখনও ঢের বাকি। বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকে নামতে হলো। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য পা-ই তখন একমাত্র ভরসা। একে তো ক্লান্ত শরীর, তার ওপর পিঠে ভারী ব্যাগ। কিন্তু থেমে গেলে তো চলবে না। সাহস করে অনভিজ্ঞ পা নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এগুতে থাকলাম গন্তব্যের দিকে। পাহাড়ের যত গভীরে যাচ্ছিলাম ততই অবাক হচ্ছিলাম। এ যেন এক অদেখা পৃথিবী। যার প্রতিটি পদে পদে রোমাঞ্চ।

এভাবে কয়েক ঘণ্টার লম্বা পথ। মাঝে মাঝে কিছু সময়ের বিশ্রাম। আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা ঝিরির পাশে করা হলো দুপুরের খাবারের আয়োজন। বিশাল এক ডাইনিংয়ে আহার শেষে কিছুক্ষণের বিশ্রাম। তারপর আবার হাঁটা। এভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর দূর থেকে যখন আমাদের প্রাথমিক গন্তব্যের দেখা পেলাম। তখন যেন আর আনন্দ ধরে না। সেই সাথে সারাদিনের ক্লান্তিও যেন জেঁকে বসল। পা যেন আর এগুতে চায় না। তবে তীরে এসে তরি ডুবলে তো চলবে না। পুরো উদ্যমে আবার চলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যে। ততক্ষণে প্রায় সন্ধ্যা নেমেছে।

আর বেশিক্ষণ দিনের আলো থাকবে না, কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকি। তাঁবু টানাতে হবে, আগুন জ্বালাতে হবে, রাতের রান্না করতে হবে, পানি আনতে হবে। সব মিলিয়ে অনেক কাজ। একই সঙ্গে সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে শীতের প্রকোপটাও বাড়ছে। আমরা কয়েক দলে ভাগ হয়ে কাজে নেমে পড়লাম। এক দল পেল তাঁবু টানানোর কাজ, আরেক দল গেল আগুন জ্বালানোর জন্য শুকনো কাঠ জোগাড় করতে। তাঁবু টাঙানো শেষ হলে গেলাম পানি আনতে। খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠাটা যতটা কঠিন, নামাটা তার চেয়েও বেশি কঠিন। পা পিছলে গেলেই বিপদ। ভয়ে ভয়ে পাহাড় থেকে পানি আনতে আনতে দেখি অন্যদল আগুন জ্বালানোর রসদ জুগিয়ে ফেলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন জ্বালানো হলো। অস্থায়ী একটি চুলা তৈরি করে রান্না বসানো হলো। চাল-ডাল মিলিয়ে খিচুড়ি রান্না হতে থাকল। এ-ই হলো আমাদের রাতের খাবার।

খাবারের গন্ধে ক্ষুধা যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল। সারাদিন তো ভালো করে কিছুই খাওয়া হয়নি। তখন সারাদিনের ক্লান্তির চেয়ে পেটের ক্ষুধাটাই বেশি কষ্ট দিচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো আকাশ ফেটে আলোকচ্ছটা বের হচ্ছে। খেয়াল করে দেখলাম না আকাশ ফাটেনি, আকাশের বুক জুড়ে এক বিশাল চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে। এ চাঁদ ইট-পাথরের শহরে জানালা বা ছাদ থেকে দেখা চাঁদের থেকে অনেক আলাদা। চাঁদের আলো যে কত অদ্ভুত, কত মায়াবী, তা এখানে এসে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না! চাঁদের এ মায়াবী আলোতে সারাদিনের ক্লান্তি আর ক্ষুধা দুই-ই পালাল।

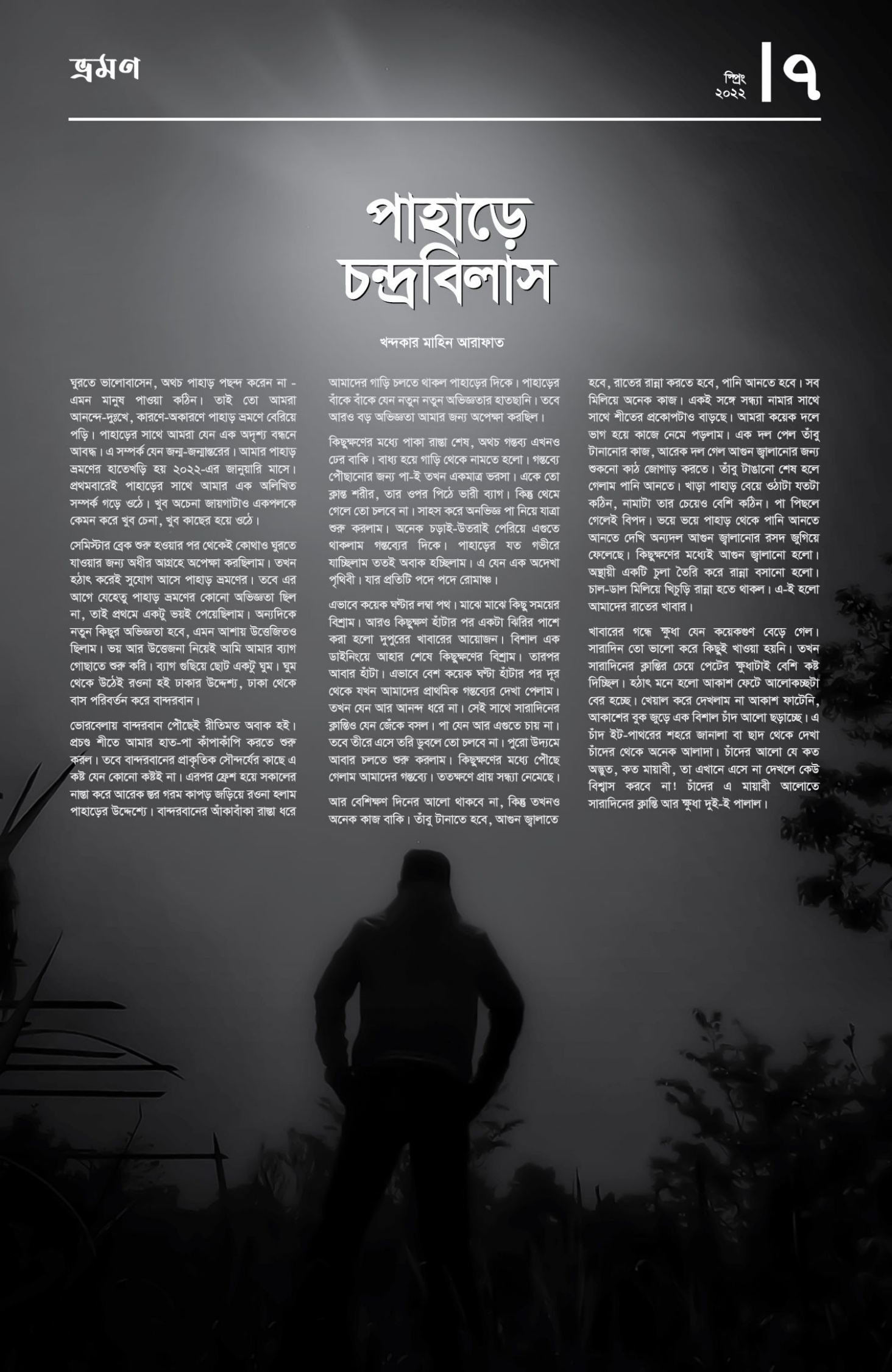

সবুজের সমারোহ এবং রোমাঞ্চের হাতছানি

আনাস ইমরান

আমি যখন খুব একাকীত্ব বোধ করি, তখন আমার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। যখন হারিয়ে যেতে মন স্থির করি, তখন ছুটে যাই পাহাড়ে। পাহাড়ে হারিয়ে যাওয়ার পর যখন পথ খুঁজে পাই, তখনই চলে যাই সাগরের অতলান্তে।

বলছিলাম একজন ভ্রমনপ্রিয় মানুষ বা একজন ট্রাভেলারের মনের কথা। পাহাড় আর সমুদ্র হচ্ছে প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখার অন্যতম মাধ্যম। সমুদ্র যেমন মুগ্ধতা ছড়ায়, পাহাড় তেমনই দেয় রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। দুই জায়গাতেই অভিজ্ঞতা ভিন্ন রকম। আজ বলব গহিন পাহাড়ে হারিয়ে যাওয়া ও প্রকৃতির খুব কাছ থেকে নিজেকে অন্যরকমভাবে আবিষ্কার করার গল্প। প্রকৃতির আশ্চর্য সৌন্দর্যকে কাছ থেকে উপলব্ধি করার গল্প। প্রথমেই বলে রাখি, পাহাড় খুবই রহস্যজনক, যার বাঁকে বাঁকে রোমাঞ্চ। আর এ রোমাঞ্চ উপভোগ করতে হলে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে। কেননা, পাহাড়ের প্রকৃতি উপভোগ করতে হলে কষ্ট পেতে হবে, আর এ কষ্ট এক নিমিষেই শেষ হয়ে যাবে যখন নিজের চোখকে বিশ্বাস না করার মতো অপরূপ দৃশ্য খুব কাছ থেকে দেখা যাবে। পাঠকের জন্য এখানে তুলে ধরব বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার গহিনে নাফাখুম ও আমিয়াখুমে আমার রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা।

প্রথম দিন

রাত দশটায় সায়েদাবাদ থেকে হানিফ বাসে উঠি। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যেই আমাদের বাস আলিকদম পৌঁছায়। সকালের নাস্তা সেরে রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে দেখি অনেক বাইকার দাঁড়িয়ে আছে। বাইকে আলিকদম থেকে থানচি যেতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টার মতো। এক বাইকে দুজন বসা যায়, রাইডারসহ ৩ জন। জনপ্রতি ভাড়া পড়ল ৩০০ টাকা। এছাড়া চাঁদের গাড়ি নেয়া যাবে বড় গ্রুপ হলে। ভাড়া ৫ হাজার টাকা চাইলেও দামাদামি করলে ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকায় পেতে পারেন। থানচি নামার পর সবার আগে গাইড মশাইকে খুঁজে বের করতে হবে, কারণ উনি ছাড়া আপনি অচল। এরপর বিরাজ ত্রিপুরা (গাইড) আমাদের নৌকা করে নিয়ে গেল পদ্মঝিরি। প্রতিটা নৌকায় ওরা পাঁচ জনের বেশি নেয় না। গাইড আর মাঝিসহ মোট আটজন বসতে পারে নৌকাতে। রাউন্ড ট্রিপ কমবেশি তিন থেকে চার হাজার টাকা নিবে। পদ্মঝিরি ট্রেইল বাংলাদেশের অন্যতম বিপজ্জনক একটা ট্রেইল। আমরা পদ্মঝিরি থেকে দুপুর তিনটায় হাঁটা শুরু করি। প্রথম প্রথম খুব ফূর্তি লাগে, আহা কী সুন্দর পরিবেশ! কিন্তু দুঘণ্টা হাঁটার পর আমার মতো স্থূলকায় মানুষের চোখে সৌন্দর্যটা আর ধরা পড়ে না। তখন মনে হয়, আল্লাহ্ এবারই শেষ! পাহাড়ে আর জীবনেও আসব না। গাইডকে দূরত্ব জিজ্ঞেস করলে ও আপনাকে বলবে, এই তো দাদা ২০ মিনিট। তার এ ২০ মিনিট শেষ হয় না ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও! পথ আর শেষ হয় না! এ যেন এক

▶ বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১০, কলাম ১

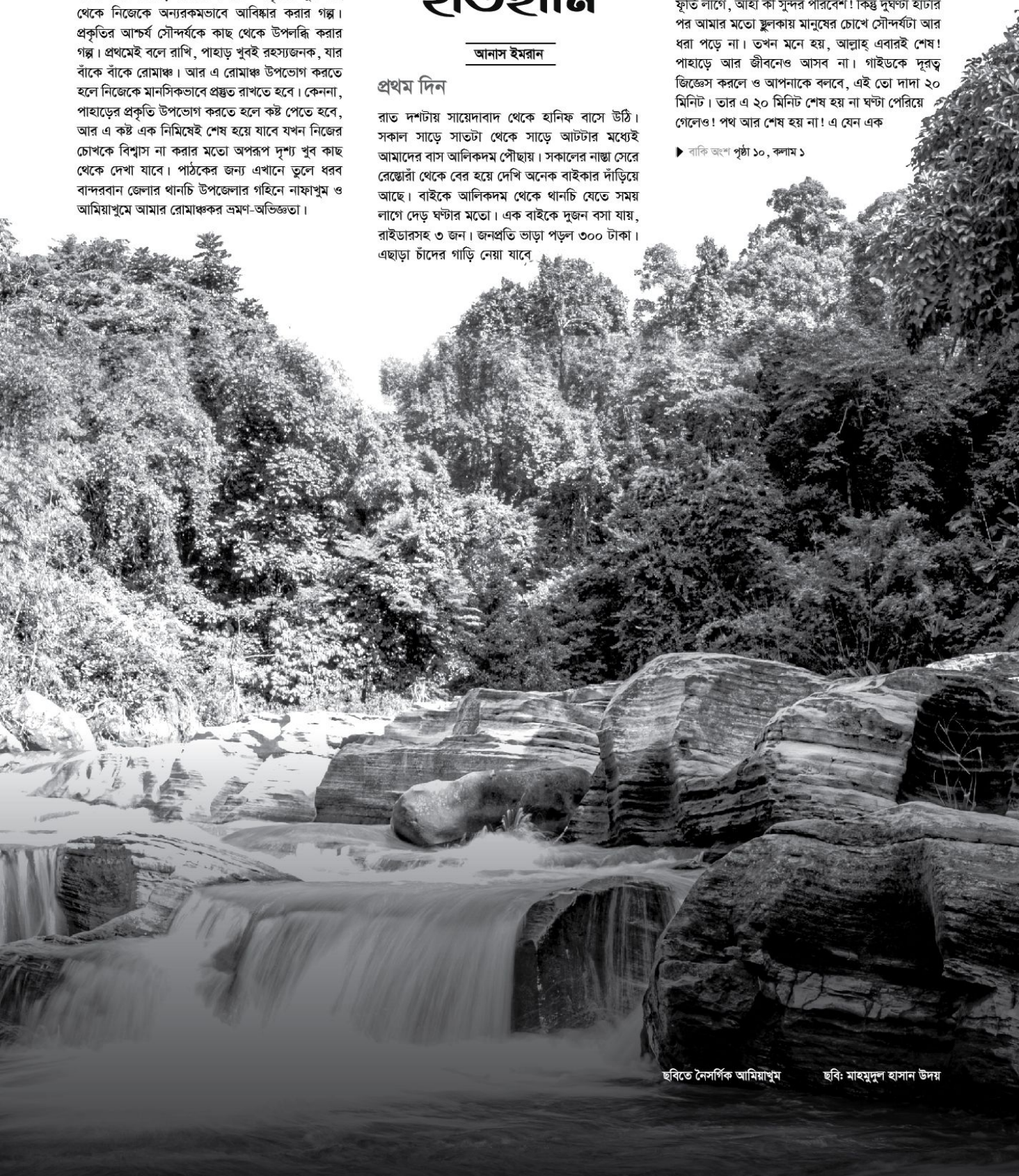

ছবিতে নৈসর্গিক আমিয়াখুম ছবি: মাহমুদুল হাসান উদয়

বাবা আমার,

তুমি এখন কেমন আছ? কী ভাবে আছ? এখন আর বুঝতে পারি না। কারণ একটাই! আজ আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। বাস্তবতা এবং রূপকথার পার্থক্য বুঝতে পারি। তোমাকে কিছু বলার থেকে না বলার পাল্লায় মেপে দেখেছি, সেটাই বেশি ভারী।

বাবা! এ শব্দটা আমার কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং এটি আমার কাছে নিষ্পাপ একটা শব্দ। ১০ জনের চোখে তুমি আজ অপরাধী, কিন্তু আমার আর মায়ের চোখে তুমি এখনও মহান। আমি ছিলাম তোমারই রূপকথার একমাত্র রাজকন্যা।

বাবা, এখনও আমার মনে আছে! যখনই সকালে আমার ঘুম ভাঙত তখন দেখতাম তোমার বুকের ওপরে আমি ঘুমিয়ে আছি। তোমার বুকই ছিল আমার সবচেয়ে নির্ভরশীল আশ্রয়স্থল, আমার সকল সাহসের উৎস। ভাবতাম তুমি আছ বলেই কোনো খারাপ কিছুই আমাকে কখনও স্পর্শ করতে পারবে না । অসুস্থ হলেই মনে হতো তোমাকে দেখলেই আমার জ্বর শরীর থেকে মুহূর্তেই নেমে যাবে।

তোমার কি আজও মনে পড়ে সে সময়ের কথা যখন তুমি রাত-দিন, ঝড়-বাদল উপেক্ষা করে আমার যেকোনো আবদার মেটাতে! আজ হয়তো রূপকথার গল্পের রাজকন্যা অনেক বড় হয়ে গেছে, অথবা, স্মৃতিতে কিছুটা মরিচা ধরেছে।

"জীবনে সময়টা বড়ই বেইমান
বড় হওয়াটা খুবই বাস্তব
আর, বাস্তবতা মেনে নেয়া কঠিন।"

বাবা, তোমার হাত ধরেই পার করেছি দুই যুগ। তোমার গায়ের গন্ধ পাই না সেই কবে থেকে, তাও আমার মনে নেই। তুমি যেদিন আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলে সেদিন সাথে নিয়ে গেছ আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। সুখ নামক সেই বস্তুটি হারিয়ে গেছে না ফেরার দেশে।

যেদিন আমাকে বিয়ে দিয়ে পর করে দিলে, আমি আমার শৈশবের স্মৃতিগুলো ফ্রেমে বেঁধে রেখেছিলাম চার দেয়ালের মাঝে। কিন্তু একদিন সবকিছু শেষ করে চলে গেলে অন্য নীড়ে, তোমাতে অপূর্ণ সব সুখের খোঁজে।

কখনও কি ভেবে দেখেছ বাবা, এক নীড় থেকে অন্য নীড়ে গিয়ে তুমি হারিয়েছ কতকিছু! তিলে তিলে গড়া সাজানো সংসার, শোবার ঘর, সকালে মায়ের হাতে চা, বৃষ্টি ভেজা দুপুরের খিচুড়ি, গোধূলি বিকেলে বারান্দায় বসে উপভোগ্য আড্ডা-এদের সবই হারিয়েছ; আর আমি হারিয়েছি প্রিয় বাবাকে, মা হারিয়েছে তার ভালোবাসাকে।

বাবা, তুমি হয়তো সুখেই আছ। আমাদের কামনাও তাই। আচ্ছা বাবা, তোমার এই সুখের দিনে মাকে কি তোমার একটুও মনে পড়ে? না কি একেবারে ভুলে গেছ।

আমায় কি তোমার মনে পড়ে? বলতে কি পার তোমার রাজকন্যার চোখ থেকে কেন অশ্রু ঝরে?

বাবা জানো, মা এখনও তোমার পথপানে চেয়ে প্রহর গুণছে! দরজার ঘণ্টা বাজলেই ভাবে তুমি এসেছ। তুমি কি জানো, মা আজও নিজেকে সাজিয়ে রাখে দিনের শেষে তোমার মুখে তাঁর প্রিয় শব্দগুলো শুনবে বলে? তুমি কি জানো...? না, আজ আর কিছু লিখব না। কিছু কষ্ট কালকের জন্য রেখে দিলাম। যেখানেই থাকো ভালো থেকো। নিয়মিত ঔষধ খেও।

ইতি
তোমার রাজকন্যা সারিকা

প্রিয় আব্বু,

কেমন আছ? আশা করছি ওপারে খুব স্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কাটাচ্ছ। আমিও ভালো আছি। ভালো থাকব না কেন? তুমি যে ওপার থেকে আমায় চোখে চোখে রাখছ। লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সুরক্ষাও করছ। আমায় কিন্তু তুমি ফাঁকি দিতে পারনি, আমি কিন্তু তোমার উপস্থিতি ঠিক বুঝতে পারি। জানো, কাল বাবা দিবস। তাই আজ তোমার কথা খুব মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সেসব দিনের কথা যখন তুমি আমায় গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে। আমার এখনও মনে পড়ে তোমার সঙ্গে লঞ্চে ঘুরতে যাবার কথা।

তবে আব্বু, আমাকে বিশেষভাবে তাড়িয়ে ফেরে সেই দিনটির স্মৃতি যেদিন তুমি আমাকে যেচে গল্প শোনাতে চাইলেও আমি শুনতে চাইনি। ফুপির বিয়ের আনন্দে আমি যেন সবভুলে সাজগোজে মগ্ন ছিলাম। কিন্তু আমি কি জানতাম ওই রাতটাই হবে তোমার শেষ রাত? সেই রাতটি মুহূর্তে মুহূর্তে আমার জীবনে যন্ত্রণা নিয়ে হাজির হয়। তুমি রাগ করে কতদূর চলে গেলে! খুব কি দরকার ছিল এমনটি করার? আমার এখন প্রায়শ মনে হয়, যদি আরেকবার পারতাম তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে! তোমার গল্পে মগ্ন হয়ে স্বপ্নের দেশে হারিয়ে যেতে। এমনটি আর কোনোদিন হবে না, সেও আমি জানি।

তোমার কথা আজ খুব মনে পড়ছে। ফিরে আস না একটি বারের জন্যে? তোমার কাছ থেকে কত গল্প শোনা বাকি আছে আমার!

ভালোবাসা নিও,

প্রভা

প্রিয় আব্বু,

তোমার জন্য ভালোবাসা। ছোটোবেলা থেকে তোমার কষ্টটা বুঝিনি, বোঝার চেষ্টাও করিনি। এখন ভাবলে বুঝতে পারি তুমি কতটা কষ্ট করেছ আমাদের পরিবারের জন্য। জীবনের সবথেকে কঠিন মুহূর্তে আর কেউ না থাকুক তুমি আমার পাশে থাকতে। আমার চাহিদার শেষ ছিল না। আমি যখন যা চেয়েছি, তুমি তখন আমাকে তা দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে। তখন হয়তো বুঝতাম না, তবে এখন সেটা তোমার অনুপস্থিতিতে হাড়ে হাড়ে টের পাই।

আমি তোমার সেই আদরে বেড়ে ওঠা বাঁদর ছেলে, যে তোমাকে ছাড়া ঠিক মতো শপিং করতে পারত না। সামনে ঈদ, তুমি ছাড়া আমার জামাকাপড় কে পছন্দ করে দেবে? আমি তো নিজে পছন্দ করে কিনতে পারি না।

তুমি যাওয়ার আগে আমাকে লিখে গিয়েছিলে, "পিতা পুত্রের হৃদ-স্পন্দন শুধু হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়। সেখানে যদি কোনো বিভ্রান্তি ঘটে, তাকে তোমার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার বা ক্যালকুলেটর দিয়েও বুঝতে পারবে না।"

আব্বু, এখন আমি কিছুটা হলেও বুঝতে শিখেছি। তোমার অনুপস্থিতিতে জীবন কত কঠিন! তোমার অনুপস্থিতিতে কফির কাপে চুমুক দিয়ে পেপার পড়ার অভ্যাসটা এখন আর নেই। তুমি শিগগির চলে এসো। ঈদের নামাজ শেষে বাসার সামনে ছবি তোলা, সবাই মিলে দাদুর বাসায় সকাল-এর নাস্তা করা - এসব তোমাকে ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না।

ইতি, তোমার অবুঝ ছেলে

তাজকির

ছবিসূত্র: ইন্টারনেট

বাবা,

জানি তুমি রাগ করে আছ। এও জানি, এ রাগ এত সহজে যাবে না। কিন্তু কী করব বাবা! সেদিন আমার কোনো উপায় ছিল না। বাড়ি থেকে যেদিন আমি চলে এসেছিলাম - নিজের পায়ে দাঁড়াতে, কিছু একটা করতে - সেদিন হয়তো আমি খুব রেগে ছিলাম। কিন্তু আমি যেই মুহূর্তে ঢাকার উদ্দেশ্যে বাসে উঠলাম, সত্যি কথা বলতে বাবা, সবার আগে আমি তোমাকেই মিস করেছিলাম। বাবা, মিডিয়া জগত হয়তো তোমার পছন্দ না, পছন্দ না ওদের সমাজও। মনে পড়ে বাবা, রাতে যখন ঘুম আসত না, তুমি গল্প শোনাতে। প্রতিবার নতুন কোনো গল্প। একদিন রাজার গল্প তো অন্যদিন রাজকুমারের গল্প, অন্য আরেক দিন আবার অন্য কোনো গল্প। তোমার অপছন্দের এ জগতের মানুষদের ওঠাবসা কিন্তু ওই গল্পের সঙ্গেই।

তোমার গলায় রিল ক্যামেরা ঝোলানো থাকত। আমরাও এখানে সেই ক্যামেরা দিয়েই কাজ করি। তবে একটু বড়, এর চোখ একটু বেশি দেখে, অথবা বড়জোড় এটি নতুন যুগের ক্যামেরা। পার্থক্য বলতে এটুকুই।

বাবা, প্রতি বৃহস্পতিবার রাতের কথা তুমি ভুলে গেছ? অফিস থেকে ফেরার পথে চিকন জিলাপিসমেত বাসায় ফিরতে। রাতের খাবার পর্ব সেরে আমরা দুজন মিলে ডিভিডিতে নতুন সিনেমা দেখতাম আর জিলাপি খেতাম। আম্মু সেজন্য আমাকে বলত, তুই তোর বাপের মতো জিলাপিখোর হবি। মায়ের কথাই ঠিক, জিলাপিখোর-এর বাচ্চা জিলাপিখোরইতো হয়। এখনও জিলাপি খেয়েই চলছি। তবে, সত্যিটা কি জানো বাবা - একা একা জিলাপি খেয়ে সেই মজা পাই না! তোমার অনুপস্থিতিতে জিলাপি আর জিলাপি মনে হয় না। একবার অভিমান ভুলে জিলাপি খেতে ডাকো না।

চাকরি পেয়ে তোমাকেই প্রথম ফোন দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাহস পাইনি। তাই, প্রাচীন এ পথটি বেছে নিলাম। আমিও নিশ্চিত তুমিও আমার মতো ছটফট করছ। কী দরকার বলো এ কষ্ট পাবার। অভিমান ভুলে ডাকো না একবার।

ইতি

তোমার ফাহাদ

শ্রদ্ধেয় আব্বু

আজ আমার মনের না বলা কিছু কথা আপনাকে উদ্দেশ্য করে এ চিঠিতে ব্যক্ত করতে চাই, যেটা হয়তো আপনার সামনে বলতে পারব না। ছোটোবেলা থেকে আপনাকে আমি সেভাবে কাছে পাইনি। বাবার সাথে ছেলের যে সম্পর্ক, তা আমি পাইনি ঠিক মতো। যখন দেখি বন্ধু বা অন্য কোনো ছেলে তার বাবার সাথে ঘুরে বেড়ায়, আনন্দ করে, তখন আমার কষ্ট হয়। খুব আফসোস হয়, যেটা আপনাকে বোঝাতে পারি না।

আজ এতগুলো বছর পরও আপনাকে সেভাবে কাছে পেলাম না। খুব ইচ্ছা করে আপনার সাথে হাসি-তামাশা করি, আড্ডা দেই, আপনার হাত ধরে ঘুরতে যাই। কিন্তু কোনো এক অজানা দেয়াল আপনার-আমার মাঝে সম্পর্কটাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। মনের ভিতর অনেক কথা জমে আছে, যা আপনাকে কখনও বলা হয়নি।

জানি, আমি আপনার মনের মতো ছেলে হতে পারিনি। আমার অনেক ভুলের জন্য আপনি হয়তো রেগে আছেন, মনে কষ্ট পেয়েছেন। আমি সেটা বুঝতে পারি। তবুও আব্বু, আপনাকে আমি ভালোবাসি, আর আমি আমার সেই আব্বুকে চাই, যে আব্বুকে আমি ছোটোবেলা থেকে পাইনি। হয়তো এই কথাগুলো সরাসরি আপনাকে বলতে পারব না। কিন্তু আমি সেদিনের আশায় থাকলাম, যেদিন আমি আমার না পাওয়া আব্বুকে পাব। আপনি যেখানেই থাকবেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

আপনার আরাফাত

ছবিসূত্র: ইন্টারনেট

সবুজের সমারোহ এবং...

▶ পৃষ্ঠা ৮ এর পর

ভয়ানক অভিজ্ঞতা! শেষ পর্যন্ত রাত সাড়ে নটায় ওই দিনের গন্তব্যস্থল জিনাপাড়ায় গিয়ে পৌঁছাই। যে যার মতো শুয়ে ৩০ মিনিটের মতো ঝিমোই। ফ্রেশ হওয়ার শক্তিও ছিল না আমাদের। তারপর গোসল করে আসতে আসতে দেখবেন আপনার জন্য গরম গরম জুম চালের ভাত, ডাল, আলুভর্তা, আলুর তরকারি, আর এক টুকরো মুরগির মাংসসহ খাবার চলে এসেছে। দাম মাত্র ১৩০ টাকা। খাবার পর কোনো কিছু চিন্তা না করেই ঘুম দিয়ে পরের দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। কেননা, পরের দিন পার হতে হবে দেবতা পাহাড়। দেখতে যাব আমিয়াখুম, সাতভাইখুম, ভেলাখুম।

দ্বিতীয় দিন

সকালে সাড়ে ছটার মধ্যে বের হয়ে প্রথমেই সকালের নাস্তা খেলাম। ডিম, ভাত, ডাল, ভর্তা দিয়ে সকালের নাস্তাই যেন অমৃতরূপে ধরা দিল আমাদের কাছে। রওনা দেয়ার আগে স্যালাইন বোতলে নিয়ে নিলাম। আর পকেটে এক প্যাকেট করে বিস্কুট, কারণ রাস্তায় কোনো দোকান নেই। আগের রাতের পদ্মঝিরির সেই বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা আজকে আমাদের অনেকটাই শক্তি যোগাল। দেবতা পাহাড় একদম খাড়া। আমাদের নামতে সময় লেগেছিল দুঘণ্টার মতো। নিচে নামার পর শুধু চোখ দিয়ে দেখবেন আমিয়াখুমের অপার্থিব সৌন্দর্য। আহা! কী অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো নয়। তবে শরীরের ব্যথা তখনও ছিল। পানিতে ইচ্ছামত দাপাদপি করে নিলাম। তারপর ভেলা করে চলে গেলাম সাতভাইখুম। ভেলার জন্য ৩০০ টাকা করে দিতে হয়, একটা ভেলায় গাইডসহ ৬ জন বসতে পারবেন। আমিয়াখুম থেকে দুটার মধ্যে রওনা দিলাম। আবার দেবতা পাহাড় পাড়ি দিয়ে জিনাপাড়ায় আসতে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাগল। ফিরে এসে দুপুর আর রাতের খাবার এক সাথে খেয়ে নিলাম। খাবার পর্ব শেষে তাড়াতাড়ি শুয়ে পরলাম, কারণ পরের দিন সকালে যাব নাফাখুম। খুশির ব্যাপার ছিল, পরের দিনের ভ্রমণের রাস্তাটা সমতলে।

তৃতীয় দিন

সকাল ছটার সময় নাফাখুমের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম আমরা। সকালের নাস্তা আগের দিনের মতোই। জিনাপাড়া থেকে নাফাখুম যেতে সময় লেগেছিল চারঘণ্টার মতো। পুরোটাই ছিল হাঁটা পথ। সেখানে পৌঁছেই গাইড দুপুরের খাবার অর্ডার করে দিয়েছিল - জুমের লাল চালের ভাত, বন মোরগ, চালকুমড়ার তরকারি আর ডাল। খাওয়া-দাওয়া শেষে বসলাম প্রকৃতির স্বাদ আস্বাদনে। সেদিনের রাতটা নাফাখুমের পানিতে চাঁদের আলো দেখে পার করব বলে সেখানে থেকে যাই। কী যে মায়া চাঁদের আলোয়, না গেলে হয়তো বুঝতাম না! নাফাখুমে পানির ছলছল শব্দ, সাথে আকাশে মিটিমিটি তারার হাসি আর পানির মধ্যে আকাশের প্রতিচ্ছবি-এ যেন অপার্থিব এক দৃশ্য।

চতুর্থ দিন

ভ্রমণের শেষ দিনে ভোর ছটায় হাঁটা শুরু করলাম রেমাক্রি ঝরনার উদ্দেশ্যে। পাহাড়ের পাশ দিয়ে তিন্দু গ্রাম পার হয়ে চলে গেলাম রাজা পাথর। রেমাক্রি একটি খরস্রোতা পাথুরে ঝিরি, ঝিরির দুদিকে ছবির মতো আঁকাবাঁকা পাহাড় আর গ্রাম। মনে হচ্ছিল জীবনের সবচেয়ে উপভোগ্য নৌকা ভ্রমণ করছি, যা স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করবে চিরকাল। মোটামুটি সাড়ে এগারোটায় নৌকা পৌঁছে গেল থানচি ঘাটে।

নৌকা থেকে নামার পর অনুভব করতে পারলাম, কিছু একটা ফেলে এসেছি। তবে সেটা ব্যবহার করার কিছু নয়, ফেলে এসেছি প্রকৃতিকে যেখানে পাহাড়ের সবুজ আর আকাশের নীল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ফেলে এসেছি অন্যভাবে আবিষ্কার করা এক নিজেকে, ফেলে এসেছি পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে খুঁজে পাওয়া রোমাঞ্চ আর রহস্যকে।

আমার হারিয়ে যাওয়া শ্রাবণ মেঘের দিনগুলো!

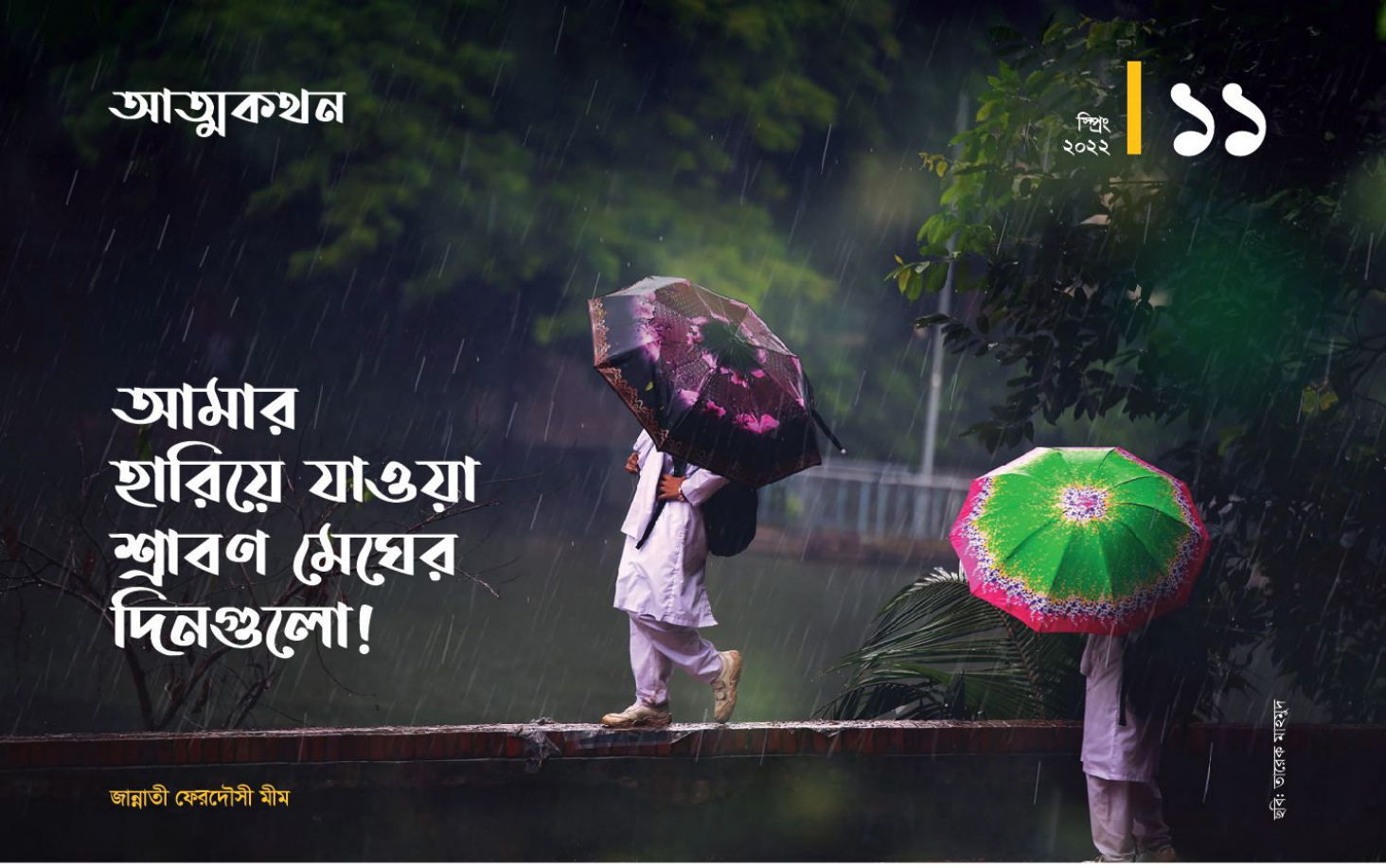

ছবি: তারেক মাহমুদ

জান্নাতী ফেরদৌসী মীম

তখন সবেমাত্র শ্রাবণ মাসের শুরু। কখনও অঝোরে বৃষ্টির ধারা বইছে, কখনও ছিঁচকাঁদুনে টিপটিপ ছন্দে, কখনও বা আবার আকাশ জুড়ে নেমে এসেছে মেঘের ঘনঘটা! বর্ষাকাল আমার বরাবরই ভীষণ প্রিয়। বর্ষা শুধু আমার প্রিয় বললে মস্তবড় ভুল হবে, সব বাঙালির মনের গহিনে থাকে বর্ষার টাপুরটুপুর ছন্দ আর ভেজা মাটির স্নিগ্ধ গন্ধ!

হুমায়ূন আহমেদ বা রবি ঠাকুরের গল্প, কবিতা আর উপন্যাসের ছোঁয়াতেই যেন প্রেমে পড়েছিলাম বর্ষার। টিনের চালে বৃষ্টিজলের সেই টুপটাপ শব্দে আজও হারিয়ে যাই অতীতের স্মৃতিচারণায়।

দ্বিতীয় শ্রেণির পরীক্ষা শেষ হয়েছিল। প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তৃতীয় শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার জন্য।

সরকারি বিদ্যালয়! চান্স না পেলে মায়ের পিটুনি থেকে উদ্ধার করার কেউ থাকবে না! এসব ভেবে বেশ পড়াশোনা করতাম!

দেখতে দেখতে পরীক্ষাও দুয়ারে কড়া নাড়ল। পরীক্ষা বেশ ভালোই হলো। ঠিক পরের দিন ফলাফল জানানো হবে। মা-বাবা এক সাথে গেলেন ফলাফল আনতে।

আমি বেচারা ভর্তি পরীক্ষায় টিকেছি কি না সেই ভয়ে জ্বর মশাইকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি শরীরে। মা এসে পিটুনি দিবে সেই ভয়ে লুকিয়ে পড়লাম মায়ের বিছানায়।

হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে দেখলাম বাবা-মা পাশে শুয়ে আছেন। খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম! পরীক্ষার ফলাফলের থেকে বেশি চিন্তা হচ্ছে মা এখনও পিটুনি কেন দিল না। এরই মাঝে মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। মা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছি।

আমাকে পিটুনি খেতে হবে না, তাতে বেশি খুশি হব না কি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছি সেটাতে খুশি হব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

বলে রাখি, আমি কিন্তু ভীষণ মনভোলা একটি মেয়ে!

পঞ্চম শ্রেণির আগে অবধি কী করে বেড়িয়েছি আজকাল আর কিছুই যেন স্মরণ করতে পারি না। তবে এটা বেশ মনে আছে, খুব ছোটবেলা থেকেই আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনতাম কখন বর্ষার আগমন ঘটবে। বর্ষার টুপটাপ ছন্দে আমি পুরো বাড়ি মাতিয়ে বেড়াতাম।

আমার শৈশবকাল ছোট্ট একটি মফস্বলে বেড়ে ওঠায় আমি প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষা শেষে আমার বায়না থাকত নানুবাড়ি বেড়াতে যাব। সে বার সবেমাত্র ষষ্ঠ শ্রেণির দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শেষ হয়েছিল। নানুবাড়ি যাওয়া নিয়ে মা খুব একটা বারণ করতেন না। তবে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কখনোই মা যেতে রাজি হতেন না। বৃষ্টি-কাদাজলে মাখামাখি করা গ্রামের সেই পরিবেশ মায়ের কাছে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যের ছিল না। কিন্তু, আমার আবদারের কাছে বারেবারেই নাজেহাল হতেন। মায়ের পিছনে বাঁদরের মতো ঝুলে থাকতে থাকতে মা অবশেষে মাথা নেড়ে সায় জানাতেন।

আর সেই মুহূর্তে আমার ঝলকানো হাসি, সেই উল্লাস তখন কে দেখে! শুরু হয়ে যেত ব্যাগপত্র গোছানো।

তারপর অপেক্ষা! কবে আসবে সেই দিন!

অপেক্ষার প্রহর শেষে যেদিন রওনা করব, সেদিন শুধুই কবিতা আওড়াতাম ছন্দে ছন্দে-

'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর, নদে এলে বান।'

কবিতা আওড়াতে আওড়াতে কখন যে কাকভেজা ভিজে আর কাদাজল মাখিয়ে নানুবাড়িতে পৌঁছে যেতাম তা খেয়ালই করতাম না। আর সেখানে পৌঁছে বর্ষার কী যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, তা ভাষায় প্রকাশ করা চারটিখানি কথা নয়!

চারিদিকে টুইটুম্বুর জলে ভরা! আকাশে আঁধারের অপরূপ আলোছায়ার খেলা! ভেজা মাটির গন্ধ! সেই সাথে বর্ষামুখর সন্ধ্যার লেবু চা আর তেলেভাজা চপ-সিঙারা! যাকে এক কথায় বলা যায়, প্রকৃত বাঙালিয়ানার ছোঁয়া!

তেমনি এক বর্ষার সকালে আমি আর আমার ছোট ভাই বেড়িয়ে পড়লাম ঘুরতে। বর্ষায় গ্রামের পথঘাট পানিতে ডুবে টুইটুম্বুর, তার মধ্যে আমরাও পুকুরপাড়ে লাফাচ্ছিলাম! হঠাৎ ধপাস একটা শব্দ! ভাইয়া পুকুর ঘাটের ঠিক পাশটাতে পড়ে গেল। মায়ের পিটুনির ভয়ে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আমি যে সাঁতার জানি না। ভাইকে বাঁচাতে তড়িঘড়ি করে লাফিয়ে পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল- ও তো সাঁতার শিখেছিল। ততক্ষণে আমি প্রায় ডুবে পুকুরের গভীরে চলে গিয়েছি।

জ্ঞান ফিরে দেখলাম সবাই যেন হেসে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমার বুঝতে বাকি রইল না! কী বোকামি করেছি আমি! কিন্তু বাবা সেটা মানতে নারাজ! বাবার এক কথা-বোন তো ভাইকে বাঁচাতে ঝাঁপ দিবেই, এটাকে বোকামি বলা যাচ্ছে না। এখনও সেদিনের স্মৃতিগুলো আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। তারপর প্রায় এক বছর আম্মু আর আমাদের নানুবাড়িতে নিয়ে যাননি।

আমাদের পাশের বাসায় একটা লতা আম গাছ ছিল। গাছটিতে নিয়ম করে প্রতি বছর দু-তিনটে আম ধরত। আমি, লাভলি আপু ও মালা আপু মিলে সেগুলো রাতের অন্ধকারে পেড়ে নিয়ে আসতাম। সকাল হতে না হতেই ওই বাসার খালা চিৎকার করে পুরো বাড়ি মাথায় তুলে ফেলতেন। আমাদেরও একটা আম গাছ ছিল। পাড়ার সবাই বলত এত মিষ্টি আম আগে কেউ কখনও খায়নি। তাই কড়া নজরদারিতে রাখা হতো গাছটিকে। কেননা, পাড়ার দুষ্টু ছেলেগুলো চোখ ফাঁকি দিয়ে আম গাছে উঠে যেত। কিন্তু এত কড়া নজরে রেখেও শেষ রক্ষা হলো না। আমার সেই সাধের আম গাছটি দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ল সিডরের হানাতে। মনে মনে ভাবতাম পাশের বাড়ির খালার অভিশাপ লেগেছিল। বেচারি তার শখের আম আমাদের জন্য খেতেই পারেনি। সেই থেকে চুরি করে আর কারও গাছ থেকে আম পেড়ে আনিনি। নিজের আম গাছ হারিয়ে আমি ভীষণ একা হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে সারা দিনরাত মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখে মা এবার নিজে থেকে বললেন নানুবাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাবেন।

সেবার নানুবাড়িতে ঢুকেই শুনতে পেলাম ওপারের বাড়ির সুচন্দা দিদির বিয়ের কথা চলছে। ছেলেপক্ষ এসে না কি দেখেও গেছে। মেয়েও তাদের ভীষণ পছন্দ হয়েছে। সুচন্দা দিদিকে পছন্দ হবে না, সে কথা বলাও ভীষণ অপরাধ।

কী সুন্দর মায়াবী মুখ! কী মিষ্টি গানের গলা! জীবনানন্দের বনলতা সেন বুঝি সুচন্দা দিদির মতোই ছিল দেখতে। আমার কেবলই মনে হতো সুচন্দা দিদিকে দেখলে জীবনানন্দ দাশ আবার একটা কবিতা লিখে ফেলতেন।

যাই হোক, হাতে গোনা সময় দশদিন। এই দশদিনের মাঝেই সুচন্দা দিদির বিয়ে শেষে আমরাও ফিরে যাব।

একদিকে যেমন অঝোর বর্ষা, অন্যদিকে বাড়িজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ। বাড়ির আনাচে-কানাচে দস্যি মেয়েগুলো কাদাজলে মাখামাখি করছে। কোথাও আবার চলছিল বাড়ির সকল বয়সের মেয়েদের শাড়ি বাছাই পর্বের আড্ডা। বাড়ির পুরুষেরা লেগে পড়েছিল বিয়ের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে, কোথায় বিয়ের মণ্ডপ সাজানো হবে, পুরোহিত মশাইকে খুঁজে নিয়ে আসা, ইত্যাদি।

মেহেদি পরার জন্য লাইন ধরে বসে আছে বাড়ির ছোট মেয়েগুলো। তখনকার সময়ে টিউব মেহেদির প্রচলন ছিল না বললেই চলে। বাচ্চা মেয়েগুলো গাছ থেকে মেহেদি পাতা ছিঁড়ে এনে বড়দের পেছনে ঘুরতে থাকত কখন মেহেদি বেটে দিবে, আর সেটা হাতে লাগাবে। এই এত আনন্দমুখর পরিবেশে আমার চোখ যেন আটকে গেল সুচন্দা দিদির দিকে তাকিয়ে।

মুখটা তার কেমন যেন মলিন দেখাচ্ছে! অস্বস্তি বোধে জড়িয়ে আছে মুখখানা!

বারবার ভাবছিলাম আমিই কি শুধু এমন দেখছি! এখানে তো বহু মানুষ আছে, কেউ কি দিদিকে দেখছে না! দিদির থেকে বয়সে আমি বছর দশেক ছোটো হব, তাই দিদির কাছে জানতে চাইতেও দ্বিধাবোধ হচ্ছিল। হঠাৎ কী যেন মনে হলে দিদিকে গিয়ে বললাম- দিদি পুকুর পাড়ে যাবি? দিদিও মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে সোজা পুকুর পাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমিও পিছুপিছু হাঁটতে শুরু করলাম। পুকুর পাড়ে গিয়ে বসতেই অঝোরে বর্ষণ শুরু হলো, আর দিদি আচমকা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। দিদিকে আমি আগে কখনও কাঁদতে দেখিনি বলে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। দিদির চোখে প্রথম কান্না আমার কাছে শ্রাবণের প্রথম বর্ষার মতো মনে হচ্ছিল। আমি কিছু জানতে চাওয়ার আগেই দিদি বলে বসলেন- 'আমি জানি তুই কী জানতে আমার কাছে এসেছিস। তুই এতটুকু মেয়ে আমার হাসির পিছনের মলিন মুখটাকে দেখলি, কিন্তু বাড়ির কেউ দেখছে না!'

কেউ সামনে বসে কাঁদছে, তাকে সাহস দিতে হলে নিজেকে আগে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে হয়। আমি তাই নিজেকে এবার অনেকটা সামলে নিয়েছি।

দিদির কাছে সাহস করে জানতে চাইলাম মন খারাপের কারণ। দিদি এবার চোখ-নাক মুছে অনর্গল বলতে শুরু করল। বলা হয়নি, দিদি সে বছর অনার্স পাশ করেছিল। দিদি স্বপ্ন দেখত ডানা মেলে আকাশে উড়বার। শহর থেকে অদূরে ছোট একটা গ্রামের মেয়ে পাইলট হবার স্বপ্ন দেখে, সেটা কেউ ধরতেই পারেনি। অথচ তাকে কিনা সংসারী করে তুলবার জন্য এত উৎসব-আয়োজন।

সেদিন অনেকক্ষণ কথা হলো আমাদের। দিদিকে বলেছিলাম বাড়িতে জানানোর জন্য। কিন্তু, দিদির মন সায় দিচ্ছিল না। দিদি জানত বাড়িতে বলে খুব একটা সুবিধে হবে না। দিদিকে বলেছিলাম তোর মন যা বলে তুই সেটাই করিস। দিদি আমার কথা রেখেছিল।

দিদি আর আমার মধ্যে সেদিনের কথাগুলো আমি আমার ডায়েরিতে লিখে রাখিনি। আমি চাইনি আমাদের কথা গুলো কেউ কখনও জানুক।

এরপর তিন-চার বছর দিদির সাথে আমার যোগাযোগ হয়নি। আমার এসএসসি পরীক্ষা চলে এলো। আমিও বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখনকার একটা ঘটনা বেশ মনে পড়ে। রসায়ন পরীক্ষা দিয়ে মায়ের সাথে বাড়ি ফিরছিলাম। পথিমধ্যে মায়ের ফোনে রিং বেজে উঠল। ওপাশ থেকে আমার নানি বলছেন আমাদের বাসার টিয়া পাখিটা আমার বই ছিড়ে কুটিকুটি করে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। শুনেই আমি আঁতকে উঠলাম। এখনও পরীক্ষা বাকি যে আমার!

হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে দেখলাম বাবা-মা পাশে শুয়ে আছেন। খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম! পরীক্ষার ফলাফলের থেকে বেশি চিন্তা হচ্ছে মা এখনও পিটুনি কেন দিল না। এরই মাঝে মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। মা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছি।

কে এই হতচ্ছাড়া পাখিটাকে খাঁচা থেকে বের করল! আমার পরের পরীক্ষার বই খেয়ে ফেলেছে, ভাবতে ভাবতে দেখি বাসার সামনে চলে এসেছি।

বাসায় ঢোকামাত্র দেখি, বেচারা এমন মুখ করে চেয়ে রইল যে আমি আর কোনোমতেই তাকে বকুনি দিতে পারিনি।

সেবার পরীক্ষা বেশ ভালোই দিয়েছিলাম। তবে রেজাল্টের কথা আসলেই আমার কেমন যেন ভীতি শুরু হয়ে যেত। মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি এসএসসিতে ভালো করব। সেদিনও ছিল ঝুম বর্ষা। শ্রাবণের মাঝামাঝি সময়! বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে ভিজে বাড়ি এসে জানালেন রেজাল্ট দিচ্ছে। আমি আর মা ওই বর্ষার মাঝেই চলে গেলাম রেজাল্ট আনতে। বর্ষা আমার জন্য সবসময় সৌভাগ্যময়। সে যাত্রায় মায়ের বকুনি থেকে বেঁচে গেলাম আবারও।

মা মুখে একটা ফেইস প্যাক ব্যবহার করতেন। একবার এমন হলো, মা সন্ধ্যার সময় মুখে প্যাকটি দিয়ে জানালার পাশে বসে আছেন। আমাদের জানালার পাশ দিয়ে চলে গেছে ছোট্ট একটা গলি। সেই গলি দিয়ে কিছু মানুষের যাতায়াত ছিল। ওইদিন আমাদের পেছনের বাড়ির ময়না নামের একটি মেয়ে গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনলাম ময়নার বিকট চিৎকার। আমরা সবাই দৌড়ে বের হয়ে দেখি ময়না অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মুখে পানি ছিটিয়ে ময়নার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হলো। জ্ঞান ফিরলে আবারও চিৎকার শুরু করে সে। আমাদের জানালার কাছে না কি একটা ভূত দেখেছে। আমাদের আর বুঝতে বাকি নেই যে ওটা ভূত না, মা ছিল। ওর ভয় ভাঙাতে মা সেদিন আবার ওর সামনেই ফেইস প্যাকটি দিয়েছিলেন।

আমার ছোট বোনটা ভীষণ দুষ্টু। সিডরের দুই মাস পরে ও জন্মগ্রহণ করে। ওর নাম রেখেছিলাম মোহনা। সেদিন মোহনার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল জানাল। মা বেশ গম্ভীরভাবে ওকে শাসন করছে। দেখেই ছোটোবেলার একটা মজার কাহিনি মনে পড়ে গেল। এখন মজার বলছি, কিন্তু তখন সেটা আমার জন্য কালরাতের সমান ছিল। ক্লাসে বরাবরই প্রথম/দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার জন্য মা এবং গুরুজনেরা আমাকে নিয়ে খুব আশাবাদী ছিলেন। একবার কী হলো, চতুর্থ শ্রেণির দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলে দেখতে পেলাম অঙ্কে ৫৬ পেয়েছি। ক্লাসের প্রথম দিকের শিক্ষার্থী হিসেবে মা এটা কোনোভাবেই মানতে পারলেন না। মা ছিলেন ভীষণ রাগী একটা মানুষ। সেদিন ফলাফল পেয়ে সেখানেই আমার অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে মন সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু কী করার আছে! আমাকে তো বাড়িতে ফিরতেই হবে!

বাসায় ঢোকার সাথে সাথেই মা জানতে চাইলেন ফলাফল কেমন হয়েছে। বাকি সব বিষয়ের ফলাফল জানালেও অঙ্কের ফলাফল বলার সাহস পাচ্ছিলাম না। সেদিন মা দরজা বন্ধ করে ভীষণ পিটুনি দিয়েছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী জড়ো হয়ে গিয়েছিল বাসায়। মা আমাকে নিয়ে অঙ্ক ম্যাডামের বাসায় চলে গেলেন। ম্যাডাম আমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিলেন কী ঝড় বয়ে গেছে। আমার অবস্থা দেখে ম্যাডাম মাকে বকুনি দিলেন। অবশ্য তেমন করার অধিকার তাঁর ছিল। তিনি যে আমার মায়েরও শিক্ষিকা ছিলেন।

সুচন্দা দিদির কথা মাঝেমধ্যেই ভীষণ মনে পড়ত। শ্রাবণ মাস আসলে সেটা আরও তীব্রতর হতো। আমি হারিয়ে যেতাম আমাদের ছোটোবেলার স্মৃতিতে। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম দিদি অনেক ভালো আছে এখন। হঠাৎ একদিন সুচন্দা দিদির কল আসল। আকাশে প্রথম দিন উড়াল দিতে যাচ্ছে, দিদি তাই প্রথম কলটা আমাকেই দেন। দিদি হাউমাউ করে কাঁদছিলেন। দিদির আকাশে উড়বার সাথে সাথে তার বাড়ির মানুষগুলোর ওপর এতদিনের জমে থাকা অভিমান শ্রাবণের বর্ষার সাথে মিলিয়ে গিয়েছিল। দিদি তার জীবন সাজিয়ে নিয়েছে। এবার ছিল আমার পালা।

আমিও পাড়ি জমাই মালয়েশিয়াতে সুন্দর দিনের আশায়। সেখানে আমার দিন বেশ ভালোই যাচ্ছিল। ফ্যাশন ডিজাইনিং বিষয় নিয়ে

▶ বাকি অংশ পৃষ্ঠা ৪, কলাম ২

ছবিসূত্র: ইন্টারনেট